রেনে দেকার্ত

ডিসকোর্স অন মেথড

জ্ঞানের পদ্ধতি বিষয়ে পর্যালোচনা

অনুবাদ : পিনাকী ভট্টাচার্য

আধুনিক ইউরোপিয় দর্শনের প্রধান জিজ্ঞাসা হচ্ছে, আমি নিশ্চিত হবো কীকরে? এটা আমরা ইউরোপের চিন্তায় প্রথম দেখি দেকার্তের রচনা 'ডিসকোর্স অন মেথড'-এ। এখানে দেকার্ত এমন একটা জ্ঞানের ভিত্তি খোঁজার চেষ্টা করেছেন, যেটার উপর দাঁড়িয়ে তিনি অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা খুঁজে পাবেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল– আমি কীভাবে জানবো এই জগত সত্য? আমার ইন্দ্রিয় কি আমাকে সত্য জ্ঞান দিচ্ছে? তাই তিনি শুরু করলেন, যা কিছুতে তাঁর সামান্য সন্দেহ হবে সেটাকেই তিনি বাতিল ঘোষণা করবেন। কিন্তু তিনি দেখলেন, তিনি যে চিন্তা করছেন এটা তো আর মিথ্যা নয়? তাই চিন্তা করতে পারেন বলেই তিনি অস্তিত্বময়। 'চিন্তা' বিষয়টাই অন্য সবকিছুর কর্তা হয়ে দাঁড়ালো। দেকার্তের এই 'থিংকিং সেলফ'ই ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট আর আধুনিকতার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। তাই আজকের জগতকে জানার জন্য দেকার্ত পাঠ জরুরি।

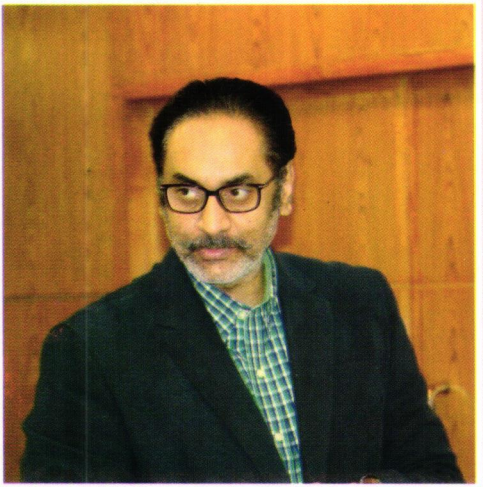

পিনাকী ভট্টাচার্য ॥

বাংলাদেশে তাঁর পরিচয় মূলত ব্লগার ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে। ফেইসবুকে আলোচিত ও সমালোচিত। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজপথ থেকে যে কজন নতুন প্রজন্মের লেখক ও চিন্তক উঠে এসেছেন, পিনাকী ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখার বিষয় বিচিত্র– দর্শন, রাজনীতি, ফিকশন। প্রথম বই দর্শনের এক ক্লাসিক– দেকার্তের 'ডিসকোর্স অন মেথড'-এর অনুবাদ। চিকিৎসক হিসেবে গ্র্যাজুয়েট এবং এখন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যবসার সাথে যুক্ত। এই বইসহ মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৭।

প্রচ্ছদ :
সাইলেনটেক্সট: আইডিয়া এন্ড ইনফিনিটি

উৎসর্গ

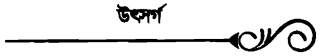

আমার বাবা শ্যামল ভট্টাচার্য
আর
মা সুকৃতি ভট্টাচার্য

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

সূচীপত্র সংস্করণের ভূমিকা

ডিসকোর্স অন মেথড অনুবাদ করেছিলাম ২০০২ সালে যখন সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রে চিন্তার ইতিহাস পাঠচক্রে ছিলাম। বইটা দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছে কিন্তু তারপরেও পাঠক বইটা পেতেন না বলে অভিযোগ করতেন। মৌলিক রচনা না হলেও এটাই ছিলো আমার মুদ্রিত প্রথম বই। সেই হিসেবে আমার একটা আলাদা ভালোবাসা এই বইটার প্রতি আছে।

এবারে বইটার প্রুফ দেখতে গিয়ে দেখলাম, বইটা আরো সহজবোধ্য আর সহজপাঠ্য করে লেখা যেত। এই ষোল বছরে লেখার কিছুটা উন্নতি তো হয়েছেই। তাই এবার বলা যেতে পারে বইটা আবার নতুন করে অনুবাদ করা হয়েছে। আরো একটা সুবিধা হয়েছে, আমি যেই বইটা অনুবাদ করেছিলাম সেই বইটা হাতের কাছে না থাকায় আরেকটা বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে, ফলে একটা নতুন পার্স্পেক্টিভ থেকে একেকটা বাক্য দেখার সুযোগ হয়েছে। তাই আরো সহজ করে প্রত্যেকটা বাক্য লেখার সুযোগ হয়েছে।

এই সূচীপত্র সংস্করণকে আপনি মোটামুটিভাবে নতুন অনুবাদ বলেই ধরে নিতে পারেন। যারা আমার আগের অনুবাদ পড়েছেন তারা এই নতুন অনুবাদ পড়লে তফাৎটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। দর্শনের একটা ক্লাসিকের সুন্দর বাংলা অনুবাদ থাকা প্রয়োজন। আমি যদি সুযোগ পাই পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ভাষাকে আরো সহজপাঠ্য করে তোলার চেষ্টা করবো।

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

প্রথম অধ্যায়: বিজ্ঞানের কয়েকটি চিন্তা ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: পদ্ধতির প্রধান নিয়মসমূহ ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়: পদ্ধতি থেকে উৎসারিত কিছু নৈতিক নিয়ম ৪২

চতুর্থ অধ্যায়: ঈশ্বর এবং মানবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ ৪৮

পঞ্চম অধ্যায়: পদার্থবিদ্যার কয়েকটি প্রশ্ন ৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকৃতির শিক্ষাকে আরো অগ্রসর করার কিছু পূর্বশর্ত ৬৮

https://nagorikpathagar.org

গ্রন্থকারের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১
- মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম
- এনলাইটেনমেন্ট থেকে পোস্ট মডার্নিজম : চিন্তার অভিযাত্রা
- সোনার বাঙলার রূপালী কথা
- ইতিহাসের ধুলোকালি
- মন ভ্রমরের কাজল পাখায়
- ভারতীয় দর্শনের মজার পাঠ
- নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ
- ধর্ম ও নাস্তিকতা বিষয়ে বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব
- রবীন্দ্রনাথ : অন্য আলোয় ঈশ্বর আত্মা কারণ
- মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম, রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
- রবি বাবুর ডাক্তারি
- চিন কাটুম
- মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ : সাফল্যের তত্ত্ব-তালাশ
- বালাইষাট
- ওয়েদার মেকার

https://nagorikpathagar.org

ভূমিকা

ইতিহাসে দেকার্তের স্থান

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দার্শনিক আর ঐতিহাসিক একবাক্যে মেনে নেবেন যে, দেকার্ত আধুনিক দর্শনের জনক– অন্ততপক্ষে এ সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক। 'জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে দর্শন এগিয়ে যাবার পথ দেখায়'–এই আপ্তবাক্য মেনে নিলে, খুব স্পষ্টভাবে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে পেছনে ফেলে দেকার্তের চিন্তাকে গ্রিসে জ্ঞানের উন্মেষ কিংবা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের উদ্ভব ও প্রসারের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেকার্ত বিষয়ে কোনো আলোচনা যথাযথভাবে শুরু করা যেতে পারে যদি তাঁর সুখ্যাতির কারণগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, আর স্থির করা যায় কোন অর্থে কতটুকু পরিমাণে সেগুলো যুক্তিপূর্ণ।

দেকার্তে ছিলেন এমন সময়ের মানুষ, যখন পৃথিবীতে বৃহৎ সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে, মধ্যযুগীয় সমাজে ভাঙনের প্রক্রিয়া চলছে আর খ্রিস্টীয় পুরোহিততন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টুকরো হতে হতে গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেছে। টটমাস একুইনাস, ডুন স্কোটাস, উইলিয়াম অব ওকাম এবং আরো অনেকে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রবল আকর্ষণের ফলে প্রকৃতপক্ষে চার্চের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছেন। প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের উত্থানে চার্চ-সাম্রাজ্যের একাংশ ভেঙে পড়েছে, রেনেসাঁসের অভিঘাতে পুনর্জাগরিত হচ্ছে হেলেনিক গ্রিক দর্শনের অনেক ধারণা, নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে পরলোকের চেয়ে ইহজগতের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে এবং মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে জ্ঞানের প্রসার আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ব্যাপকতর হচ্ছে।

দেকার্ত কিংবা সপ্তদশ শতকের শুরুর সময়ের কোনো মানবগোষ্ঠী বা শক্তি-সমাবেশ মধ্যযুগের পতনের একক কারণ নয়; বরং এই যুগের অন্তর্গত সংকটেই তা বিলুপ্ত হয়েছে আর এই সংকটের শুরু হয়েছে বেশ কয়েক

https://nagorikpathagar.org

শতাব্দী আগে থেকেই। দেকার্তকে যদি পুরানো ব্যবস্থা ধ্বংসের প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী করা না যায়, তবে নতুনের সৃষ্টির একক কৃতিত্বও তাঁকে দেয়া অসম্ভব। মধ্যযুগের অবসানের পরে ইউরোপীয় সভ্যতা কোন পথ নেবে তা স্থির করার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল অনেক মানুষ ও ঘটনা-পরম্পরা। রজার বেকান, ফ্রান্সিস বেকন, হবস, ম্যাকিয়াভেলী এবং মন্টেইগের মতো দার্শনিক; কোপার্নিকাস, ব্রুনো, কেপলার এবং গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানী; ওয়াইক্লিফ, লুথার কেলভিন প্রমুখ ধর্ম-সংস্কারকদের সঙ্গে নতুন নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের মতো ঘটনা, চিত্রকলা এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার, তার সঙ্গে হেলেনিক সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার একসঙ্গে প্রভাবিত করেছে ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় চিন্তাকে। দেকার্তের অবস্থান অতি উচ্চে তুলে দিয়ে এইসব ঘটনাকে খাটো করা উচিত নয়।

এসব স্বীকার করে নিলেও এটা সত্যি যে, আধুনিক সংস্কৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণে দেকার্তের অবদান এমন যে, তা যেকোনো একক ব্যক্তি, কোনো ক্ষুদ্রগোষ্ঠী বা কোনো ঘটনাবলীর অবদানকেও বহু পেছনে ফেলে যায়। দেকার্তের প্রভাবকে প্রধানত ছয়টি মূলধারায় সংবদ্ধ করা যায়।

প্রথমত, তাঁর সমসাময়িক অনেকের মতো দেকার্ত কর্তৃত্ববাদকে (Authoritarianism) অবিশ্বাস করতেন এবং সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি মানুষের নির্ভুল যুক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। দেকার্তে আংশিকভাবে রোমান ক্যাথলিক কর্তৃত্ববাদের পড়ন্ত অবস্থার জন্য এবং মূলত ফ্রান্সে খ্রিস্টীয় 'পুরোহিততন্ত্রের' বিরোধিতাকে অগ্রসর করিয়ে নেবার জন্য নেতিবাচকভাবে দায়ী। ইতিবাচক দিকে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে সমর্থন করেছিলেন যা সর্বোচ্চ অবস্থানে বসিয়েছিল মানুষের বিবেককে, যেটা আজকের গণতান্ত্রিক তত্ত্বের প্রধান উৎস। লক যেমন দেকার্তের গণতান্ত্রিক প্রবণতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, বাদ দিয়েছেন মানসজাত ধারণার একমাত্র তত্ত্ব। যা থেকে উৎপত্তি হতে পারে অতিপ্রাকৃত নীতিতত্ত্ব বা এথিক্স। হিউম লকের নীতিতান্ত্রিক বিশ্বাসের ধারণাকে গ্রহণ করেছেন যা পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছে বেনথামের নৈতিকতা, রাজনীতি ও অর্থনীতির তত্ত্বে। নরথর্প The meeting of east and west–এ বিস্তৃত আলোচনায় বলেছেন যে, আধুনিক আমেরিকাকে বুঝতে হবে লকের দৃষ্টি দিয়ে আর আধুনিক ইংল্যান্ডকে প্রধানত বেনথামের দৃষ্টিতে। তেমনি ফরাসি রাজনৈতিক দর্শনও একইভাবে এনলাইটেনমেন্ট যুগের ফরাসি দার্শনিকদের চিন্তা দিয়ে প্রবলভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত হয়েছে। এই দার্শনিকগণ আবার

https://nagorikpathagar.org

দেকার্তের দর্শন এবং আংশিকভাবে ইংরেজ দর্শন দিয়ে সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে।

আমাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দেকার্তের যুক্তিবাদ (Rationalism) এবং বৈজ্ঞানিক আশাবাদ (Scientific optimism)। তিনি নিশ্চিত, পৃথিবী মূলত যৌক্তিক এবং বোধগম্য; সে-কারণে একজন দার্শনিকের প্রচেষ্টায় দর্শনের লক্ষ নিঃসন্দেহে অর্জন করা সম্ভব। সেজন্যই পরবর্তীকালে প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে দার্শনিকরা এমন সব ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন যা তাঁরা মনে করতেন পরম সত্যের (Absolute truth) কাছাকাছি। এভাবেই বিজ্ঞানের লক্ষ অর্জিত হবে এবং পৃথিবী একটা নিখুঁত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হবে বলে বিশ্বাস করা হতো। দেকার্ত বিশ্বাস করতেন তাঁর জীবদ্দশাতেই এই লক্ষ অর্জন করা সম্ভব। বিজ্ঞানের মাধ্যমে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি সম্ভব–এই ধারণা ইতিহাসের আধুনিক পর্যায়ের পুরোটা সময় ধরে ক্রিয়াশীল ছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত মনে করা হতো বিজ্ঞানের সর্বশেষ সাফল্য প্রায় নাগালের মধ্যে।

এমনকি দেকার্ত আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি পদ্ধতিও প্রচার করেছিলেন: তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, পৃথিবীর সমস্ত নিয়মকেই সার্বজনীন হতে হবে এবং একটি সাধারণ মৌলিক নিয়ম থেকে তা উৎসারিত হতে হবে। এর মানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হবে নতুন তথ্য বা উপাত্ত জানার মাধ্যমে নয়, ইতোমধ্যেই অন্যান্য ক্ষেত্রে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তা আত্মীকরণের মাধ্যমে। যেমন: নিউটন গ্যালিলিওর পড়ন্ত বস্তুর সূত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন কেপলারের গ্রহসংক্রান্ত গতিসূত্র। তবে জ্ঞানের সূত্রগুলো জোড়া দেয়ার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে যুগান্তকারী উদাহারণ হচ্ছে দেকার্তের নতুন বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি (Analytic Geometry)–সেটা তৈরি হয়েছে বীজগণিত এবং জ্যামিতিকে যুক্ত করে। এই অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এই পদ্ধতি শুধু অমিত বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার দরজা খুলে ধরার উদাহরণ নয়, একই সঙ্গে তা আধুনিক গণিতেরও ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি থেকে পরবর্তীকালে লাইবনিজ আর নিউটন যুগপৎ ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন এবং ক্যালকুলাস ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক গণিতের কাঠামো যা এ যুগে প্রকৃতিকে জানার কাজে যুক্ত হচ্ছে।

দেকার্তীয় প্রভাবের তৃতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দর্শনশাস্ত্রের অগ্রসর হওয়া। আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি

https://nagorikpathagar.org

এত সহজাত যে, এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি–তা বিশ্বাস করাই কষ্টকর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সংশয়বাদীদের বাদ দিলে গ্রিক এবং রোমানরা এই পদ্ধতিকে সামান্যই দার্শনিক মূল্য দিত। অন্যদিকে দেকার্তের পরে এই দেকার্তীয় পদ্ধতি ইংল্যান্ডে মনোবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ইংল্যান্ড তথা পাশ্চাত্যের দর্শনসমূহে তার উপস্থিতি দেখা যেতে থাকে। শিল্পরূপে তার প্রকাশ ঘটে Pointillism-এ, সাহিত্যরূপে এর স্ফূর্তি দেখা যায় ব্রাউনিংয়ের কবিতা আর জেমস জয়েসের উপন্যাসে। এই তালিকা ইচ্ছেমতো দীর্ঘ করা সহজ, কেননা গত কয়েক শতকের চিন্তার জগতে সংখ্যাতীত ধারণা আর সৃষ্টিকর্মের পেছনে পাওয়া যাবে যুক্তিবাদ বা Reason.

চতুর্থত, দের্কাতের দেয়া সত্তার (Self) অস্তিত্বের প্রমাণ এ প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এলো যে, সেই, 'নিশ্চিতভাবে অস্তিত্বময়' সত্তার প্রকৃত রূপ কী? দেকার্তের যুক্তিতে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ ছিল না যে, এই সত্তা অমর এবং এর ফলে অমরত্বের যৌক্তিক অথবা অভিজ্ঞতা-নির্ভর প্রমাণের সেই পুরানো আগ্রহ আবার সামনে চলে আসে। ঐতিহাসিকভাবে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'সত্তার' তো কোনো পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই যে, পুরো জীবনকালে সত্তার প্রকৃতি একই রকম থাকে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটিমাত্র সত্তাই অস্তিত্বময় থাকে। দেকার্তীয় দর্শনের এই মৌলিক অসংগতির ফল তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পায়নি। যেহেতু মানুষ সাধারণত তাদের পূর্ব অভ্যাসগত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্নাতীতভাবে দেকার্তের দর্শনকে গ্রহণ করেনি। তার ধারণা কেবল চিরায়ত ধারণার মূলে আঘাত করল এবং ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও অস্তিত্বের পরিচয় আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে পৃথিবী অগ্রসর হলো।

দেকার্তের পঞ্চম প্রভাব হচ্ছে অধিবিদ্যক (Metaphysical) দ্বৈততার ধারণার প্রকাশের ক্ষেত্রে। এটা প্রবলভাবে আমাদের মানস-ঐতিহ্য এমনভাবে লগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, দর্শনের শিক্ষা নেই এমন মানুষও মনে করতে লাগল দেকার্তীয় দর্শনই একমাত্র সত্য এবং অন্য সব দার্শনিক চিন্তা বরং স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে অস্বীকার করছে। প্রাতিষ্ঠানিক দর্শনশাস্ত্রের কাছেও এই দেকার্তীয় দ্বৈততা তার দুর্বোধ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ: মৌলিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই সত্তা কীভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারে যেখানে এই বিশ্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সুসংহত? বিশেষত, যখন প্রায় সকল দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী এ প্রসঙ্গে একমত যে, অনেক অসংলগ্ন ঘটনার ভিড়ে সকল ঘটনা একই রকম? এবং 'মন', যা কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থান করে না তা কোনো বস্তুকে এক

https://nagorikpathagar.org

জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কীভাবে স্থানান্তরিত করতে পারে? বা একটা বস্তুকণা যা নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না, তা মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায়– এমন ধারণা কীভাবে তৈরি করে? এই জটিল সমস্যার উত্তর খোঁজা হয়েছে তিনটি মাত্রায়: বিজ্ঞানে, মহাকাশ বিদ্যায় এবং Ontology–তে[১]। যদিও এই তিনটি বিষয়ই তাদের অগ্রসরমানতার ক্ষেত্রে একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

বিজ্ঞানের বিষয়ে দেকার্ত বিশ্বাস করতেন বস্তুর গতির পরিমাণ অপরিবর্তনীয়, কিন্তু মন বস্তুর গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। কিছুদিন পরে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল, গতিজড়তার সূত্র ছাড়া বস্তুজগতের অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে এই তত্ত্ব খাপ খায় না। কারণ, গতির পরিবর্তন বলের প্রয়োগ ছাড়া ঘটে না, আবার সকল ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। সেজন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু এবং মনের ক্রিয়ার দার্শনিক ব্যাখ্যা আরও বেশি ব্যাপক এবং তির্যক (Elaborate indirect) রূপ নেয়। কিন্তু মৌলিকভাবে কোনো ব্যাখ্যা, তা যতই সূক্ষ্ম এবং জটিল হোক না কেন, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারেনি। কেননা বিজ্ঞানের ধারণায় বস্তুজগতের যেকোনো ঘটনার প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিজ্ঞান মনে করতো এই প্রয়োজনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা অবশ্যই যৌক্তিক। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মই এমন যে, যেকোনো ঘটনা যৌক্তিকভাবে প্রকৃতি থেকেই উৎসারিত হয়। কিন্তু দেকার্তের মেটাফিফিক্যাল (অধিবিদ্যক) দ্বৈততা যদি সঠিক হয়, তবে ভৌত ঘটনার যৌক্তিক কারণ অন্য ভৌত ঘটনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এই দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রবলভাবে সমর্থিত হলো। কেননা একজন বৈজ্ঞানিক যখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ধিত রূপ হিসেবে পরীক্ষণের যন্ত্র ব্যবহার করেন, তা কোনো আধিভৌতিক কিছুর অস্তিত্বকে দেখতে পায় না, এমনকি যদি তার অস্তিত্ব সত্যও হয়।

একইভাবে মনে সৃষ্ট ভৌত কার্যকারিতার বিরুদ্ধে কোনো যৌক্তিক সংস্কার কখনো গড়ে ওঠেনি। কেননা মনোবিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞান মূলত জ্ঞানের জগতে তখনো নবাগত এবং ভৌতবিজ্ঞানের তুলনায় তখনো খুব একটা সম্মানের আসনে ছিল না। তাই আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুজগতে স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং ভৌত ঘটনায় মনের প্রভাবের বিরুদ্ধে এক প্রবল সংস্কার নিয়ে গড়ে ওঠে। টেলিপ্যাথি, দ্বৈতসত্তা এবং সম্মোহনবিদ্যার বিরুদ্ধে বিপুল বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। সোজা কথায়, মনের শক্তির তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হয়। এর প্রভাবে মনোবিদ্যায় মানুষের ধারণা এবং ইচ্ছার কোনো কার্যকারিতা

https://nagorikpathagar.org

থাকল না এবং 'মস্তিষ্কের অবস্থা' মনোবিদ্যায় 'মনের অবস্থা' বলে বিবেচিত হলো। কিন্তু অন্যদিকে এটা আরেক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। দেকার্তের মনোজগতে বস্তুজগতের সমান গুরুত্ব ছিল। এখন 'মন' এমন একটি অবস্থায় পড়ল, যখন তা নিজেই অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হলো। এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আচরণবাদ[২] হচ্ছে প্রকৃতিজাত পরিমাণ এবং মনোবিদ্যার উদ্দীপন-প্রতিক্রিয়া অথবা প্রাণীসত্তা ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে পুনসংজ্ঞায়ন। জীববিদ্যার এই তত্ত্ব এমন ধারণার জন্ম দিল যে, মনের বৈশিষ্ট্য বংশগত নয়। এ ধরনের সমস্ত ঘটনা উত্তরাধিকারজাত নয় বলে মনে করা হলো; মনে করা হলো সেটা কিছু অজানা শরীরবৃত্তীয় ঘটনাক্রমের ফল। লক্ষ্য করা উচিত যে, এ সমস্ত সংস্কার আসলে আংশিকভাবে দেকার্তীয় দ্বৈততার অবদান। কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা পদ্ধতিকে এককভাবে এজন্য কৃতিত্ব দেয়া যাবে না। বিজ্ঞানে দাবি করা হয় যেকোনো ঘটনার কার্যকারণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণটা বস্তুগত বা Epiphenomenalism যা সব সময়ই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আকর্ষণহীন ছিল, বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে মিথষ্ক্রিয়ার সমস্যা সম্পর্কে দেকার্তের উত্তর খুবই সাধারণ এবং তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত। কেননা তাঁর বক্তব্য ছিল 'ঈশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে "এভাবেই ইচ্ছে করেছিলেন"। সমস্যা সমাধানে দৈব সাহায্যের এই বিষয়টি আসলে কোনো কিছুরই ব্যাখ্যা দেয় না। কেননা তা সবকিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে–এই বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে, কোনো বিশেষ সুবিধার জন্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ঈশ্বর প্রকৃতির বিষয়ে অযৌক্তিকভাবে কাজ করবেন। দেকার্তের তত্ত্ব গুলোনক্স এবং তাঁর ইউরোপের কার্টেসীয় অনুসারীরা বিস্তৃত করেছেন যাতে সমস্ত মিথষ্ক্রিয়ার দায় ঈশ্বরের ওপর সার্বক্ষণিকভাবে আরোপিত হয়েছে। মহাবিশ্বের প্রশ্নে আরেকটি সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে মিথষ্ক্রিয়ার অস্তিত্বই অস্বীকার করা। কেননা এর দৃশ্যরূপ আসলে অলীক; কারণ, ভৌতজগৎ এবং মনোজগৎ নির্ভুলভাবে সমান্তরাল। লাইব্‌নিজ এই ধারণাকে আরও এগিয়ে নেন।

Ontilogical (সত্তাতাত্ত্বিক) বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত মহাজাগতিক বিষয়ের সঙ্গে–যেখানে দ্বৈততার সমস্যা মুখোমুখি হয় দ্বৈততা অস্বীকারের সঙ্গে। নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদের এক অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত– 'মন এবং বস্তু ভিন্ন' এই তত্ত্বের অস্বীকার। লাইব্‌নিজ এবং স্পিনোজা এটাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। এর অনেক পরে আমরা পাই বহুত্ববাদ এবং আধুনিক

https://nagorikpathagar.org

Realism, যা এই একই সমস্যার উত্তর খুঁজতে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে আদর্শ সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'বস্তু অস্তিত্বহীন'। বার্কলে এই সিদ্ধান্তের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি। এমনকি মলেব্রাশ এবং লাইব্‌নিজকেও সহজেই ভাববাদী বলা যায়। ভাববাদ দ্রুতই দর্শনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা হয়ে উঠল। এভাবে দেকার্তের দ্বৈততা স্বাভাবিকভাবেই পথ খুলে দিল বিজ্ঞানের বস্তুবাদী ধারা এবং দর্শনের ভাববাদী ধারার।

ষষ্ঠ এবং শেষ ক্ষেত্র, যেখানে দেকার্তের প্রভাব সহজে লক্ষণীয় তা হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্ব। এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বিবেচনা করা যায়। প্রথমটি সত্যের সঙ্গে ঐক্যের তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কমপক্ষে কিছু ধারণা সত্য যতক্ষণ পর্যন্ত তা জগতের বাস্তবতার অবিকল প্রতিরূপ। দ্বিতীয়টি জ্ঞানের ত্রিমাত্রিক উৎস। দেকার্তের মতে, অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞানের অর্জন সম্ভব। কেননা আমাদের স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ধারণা আছে কোনটা অবশ্যই সত্য হবে। লক্ষ করুন, ধারণা এখানে বিচার্য বিষয়, সংবেদন নয়: জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান, শুধু বস্তুর বাহ্যিক রূপকে গ্রহণ নয়। কিন্তু বাহ্যিক রূপ অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্ত স্পষ্টভাবে আরেকটি তথ্যের উৎসের সঙ্গে আছে। অন্ত র্দৃষ্টি এবং শরীরের ভেতরের অনুভূতি আর বাইরের ইন্দ্রিয়ের সংবেদন। যখন আমাদের কোনো পূর্বজ্ঞান থাকে, অন্যান্য জ্ঞান তা থেকে সংশেষ করা যায়। জ্ঞানলাভের এই তিন পদ্ধতি আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র নয়। আমরা যদি বিবেচনা থেকে প্রকাশিত সত্য এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে দেকার্তের যুক্তিকে বাদ দিই, যা বিশেষ একটা সমস্যা সৃষ্টি করছে, তাহলে এটা বলা সম্ভব যে, অনুমান অথবা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা সব সময় একটা মধ্যবর্তী উপাত্ত অথবা অনুমিতি নিয়ে কাজ করে। এভাবে সত্য অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতাবাদী এবং যুক্তিবাদী পথ দেকার্তের যৌক্তিক পদ্ধতির দুটো ধারা হয়ে ওঠে যা জ্ঞানতত্ত্বে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে যেমন মেটাফিজিকসে সমস্যা সমাধানে দৈব সাহায্যের বিষয়টি[৩]। কিন্তু দেকার্ত এই অলৌকিক প্রজ্ঞাকে বাতিল করুন অথবা নাই করুন তা কিন্তু তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের বিপরীত ছিল এবং সে কারণেই চূড়ান্তভাবে দেকার্তকে অস্বীকার করা লকের জন্য অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। লক আবার অন্যপথ ধরেছিলেন এবং সমস্ত জ্ঞানকে দেকার্তের চেয়ে এক কঠিন বিপন্ন অবস্থায় ফেলেছিলেন। যা পরবর্তীকালে বার্কলে এবং হিউম স্বচ্ছতা এনেছিলেন।

দেকার্তের 'ঐক্যের তত্ত্ব' অনুসারে একটি ধারণা কেবল আরেকটি ধারণার অবিকল প্রতিরূপ হতে পারে এবং কখনই সম্পূর্ণভাবে এই বস্তুজগৎ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এজন্যই বার্কলের ভাববাদ একটি যৌক্তিক পরিণতি। আরও

https://nagorikpathagar.org

বিশেষণে দেখা যায়, ধারণাকেও চিন্তাশীল সত্তা অথবা ঈশ্বরের প্রতিরূপ হতে বাধা দেয়া হয়েছে। যাতে বার্কলের অবস্থান হিউমের সংশয়বাদী অবস্থানকে পথ করে দেয়। লকের দর্শন দেকার্তের পিছুটানকে পরিত্যাগ করে এই উৎস নির্ণয় অবশ্যম্ভাবী করেছিল। দেকার্ত শুধু দাবি করেছিলেন যে, কিছু ধারণা 'ঐক্যের তত্ত্ব' দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এর সঙ্গে লক হিউমের সংশয়বাদিতার আরো সরাসরি পথ বাতলে দিলেন; যদি ইন্দ্রিয়লব্ধ হয়, তবে স্পষ্টভাবে বলা যায়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের তথ্য ছাড়া কোনো তথ্য নেই এবং জাগতিক, মানসিক এবং যৌক্তিক তত্ত্বের বাতিল সমস্যা পরিষ্কারভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই পরবর্তীকালে জার্মান ভাববাদের পথ তৈরি করে কান্টের পথে নিয়ে যায় এবং আধুনিক প্রবণতায় বিজ্ঞান এবং দর্শনে অন্যান্য সবকিছুর আগে পদ্ধতির সমস্যা বিবেচনায় নেয়।

দেকার্ত এবং বিজ্ঞান

ইতিহাস দেকার্তকে একজন দার্শনিক হিসেবে এবং আধুনিক গণিতের জনক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সত্যি কিন্তু তাঁকে বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকার করতে ইতিহাস সে পরিমাণে অকুণ্ঠ নয়।

যদিও দেকার্ত নিজেকে ততটুকুই বিজ্ঞানী মনে করতেন, যতটুকু নিজেকে গণিতজ্ঞ অথবা দার্শনিক মনে করতেন। তিনি অন্য যেকোনো পরিচয়ের চেয়ে বিজ্ঞানীর পরিচয়ে গর্ববোধ করতেন। আমরা তাঁর 'ডিসকোর্স'-এর প্রকাশ সম্পর্কে দেখানোর চেষ্টা করবো যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ছিল অসামান্য, এমনকি তা তাঁর গণিত বা দর্শনের মেধার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। দেকার্তের বিজ্ঞানকর্মকে অনুমান-নির্ভর বলা, অনেক পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া এবং সামান্য কটি অপ্রমাণিত তত্ত্ব দেবার জন্য সমালোচনা করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সমালোচনাগুলো কীভাবে করা হয়েছিল এবং প্রচুর অপব্যাখ্যার পর কীভাবে তা অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল তা বোঝার জন্য এই সমালোচনাগুলোতে আমাদের জন্য পর্যাপ্ত সত্য নিহিত আছে।

প্রথমত, দেকার্ত তাঁর শরীরতত্ত্বে এবং নিজের আচরণে দেখিয়েছিলেন যে, তিনি একজন ভালো নিরীক্ষক। কেউ যদি তাঁর লেখা মাঝে মধ্যেও পড়ে থাকেন, তিনি লক্ষ করবেন প্রায়শই কোনো বিশেষ পরীক্ষণের নিখুঁত বর্ণনা আছে, যেন পাঠক এইভাবে পরীক্ষাটি করলে ঠিক ঠিক এইসব ফলাফল

https://nagorikpathagar.org

পাবেন। কিছু ক্ষেত্রে দেকার্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন যা তিনি পর্যবেক্ষণ করেননি। এই সামান্য কয়েকটি বিষয় ছাড়া দেকার্তের তথ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল। যখন আমরা দেখতে পাই যে, কিছু তত্ত্ব আমাদের কাছে প্রায় নির্ভুল বলে প্রতিভাত হয়, তবে বেশিরভাগ একেবারেই ভুল এবং কয়েকটি অসম্ভব–সেগুলোই অনুমানের মাধ্যমে কোনো উপসংহারে পৌঁছতে সাহায্য করে এবং পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সেইসব ক্ষেত্রে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, আমরা অনুমানের মাধ্যমে নয় বরং ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা স্থির করেছি। সমস্ত সত্যকে অবশ্যই নিরীক্ষা দিয়ে প্রমাণিত হতে হবে (অনুমেয় যে, দেকার্ত নিজের প্রসঙ্গেই একথা বলেছেন, কেননা তিনি ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রস্তাবনা করেছেন যে সমস্ত পরীক্ষা অন্যরা করে দেখেন সেগুলো তিনি অবশ্যই নিজে করে দেখবেন) এবং যে সমস্ত তত্ত্ব একটি হাইপোথিসিসের প্রতিনিধিত্ব করে, তা তৈরিই হয়েছে সত্যকে বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য। তা পূর্ব-অভিজ্ঞতা (a priori) প্রসূত সত্য নয় যা থেকে সত্য অনুমিত হবে।

কিন্তু যদি দেকার্ত সত্যিই একজন অভিজ্ঞতাবাদী এবং নিরীক্ষক হতেন, তাহলেও এটা বলা যায় যে, তাঁর অভিজ্ঞতাবাদে যুক্তি নিশ্চয়তাবাদের ছোঁয়া ছিল যা আধুনিক বিজ্ঞানীদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র করেছে। প্রথমত, দেকার্তের মতে, অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি সকল জ্ঞানের জন্য যথার্থ পদ্ধতি নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকলেও, সততার সঙ্গে হোক বা না হোক, চার্চের মতকে বিশ্বাস করতে হবে এটাই ছিল দেকার্তের মত। এরপরে দার্শনিক বা জগৎ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে যা শুধু সাধারণ অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভর করে, কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভর করে না। সে কারণে তাকে বলা যেতে পারে অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংবেদন (Sense a Priori) এবং যা চরিত্রগতভাবে অনুমান-নির্ভর। 'এভাবেই দেকার্ত যখন বিশেষ বিশেষ অনুমান করতে গেলেন তখন যেমন ঈশ্বর, বস্তু ও মনের প্রকৃতিকে জানলেন তেমনি স্থান, কাল ও পদার্থবিদ্যার কিছু সাধারণ সূত্রকেও জানতে পারলেন। এতে বিভিন্ন সম্ভাবনার বাস্তব বিষয় সামনে এলো, যা থেকে প্রতীতি হলো অনুমানের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।' প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো 'কার্য' দেখে কারণ আবিষ্কার করার এবং অনেক নিরীক্ষারও। দেকার্তীয় ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে দ্বিতীয় যে তফাৎ আমরা আবিষ্কার করবো, তা হচ্ছে 'যুক্তি'। বেকন এবং মিলের মতো দেকার্ত চিন্তা করেছিলেন যে, কোনো ঘটনার পেছনে কার্যকারণের এক দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা যায়। কোনটি আসল কারণ তা বের করার জন্য নিরীক্ষার প্রয়োজন। নিরীক্ষাই ভুল কারণগুলোকে

https://nagorikpathagar.org

বাদ দিয়ে আসল কারণকে বের করে আনবে। যেহেতু কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত এর থেকে বেরিয়ে আসে, সমস্ত সম্ভাব্য কারণ আমরা অনুমান করি। জগৎ যৌক্তিক যেমন আমরা এবং বিজ্ঞানের নিয়মগুলো সূক্ষ্ম, জ্ঞেয় এবং উপলব্ধিযোগ্য; যখন তা আবিষ্কৃত হয়, তখন তা সমস্ত সম্ভাবনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাই অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানের পদ্ধতি নিয়ে সত্যের সন্নিকটে যাওয়ার ইঙ্গিত দেকার্ত দেননি। আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি সত্যের সন্নিকটে যাওয়ার একটা প্রক্রিয়া এবং মানুষের ক্রমাগত অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে আগের সূত্রকে সত্যের আরো নিকটবর্তী তত্ত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। একইভাবে কয়েকটি সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বেছে নিলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য অর্জন করা যায় এবং সেই বিশেষ সম্পর্কে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন ফুরায়। তাই আধুনিক বিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেকার্তের বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো পড়তে পারেন তাঁর অর্জনের জন্য, তাঁর ভুলগুলোকে মেনেও নিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা আশ্চর্য হন তাঁর আত্মবিশ্বাসে। দেকার্ত যেমন করতেন, একজন আধুনিক বিজ্ঞানীও তেমনি তার একটি হাইপোথিসিস শতবার পরীক্ষা করবেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই মানুষের সামনে আরও সুনিশ্চিতভাবে আপাত স্থিরীকৃত রূপে উপস্থাপন করবেন। যখন একক বিজ্ঞানী সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে, দেকার্তের সময় থেকে বিজ্ঞান সেই প্রজ্ঞা অর্জন করেছে যা সক্রেটিস নিজের ওপর আরোপ করেছিলেন।

এই আচরণের আরেক পরিণাম এই ধারণা যে, বিজ্ঞানের দায়িত্ব সসীম এবং তা সম্পন্ন হবে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। এটাই ছিল বেকনের ধারণা এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগের পরেও তা প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত সময়সীমার অনেক আগেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিরাট উৎক্ষেপ ঘটেছিল, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত রহস্য ভেদ করার মতো এবং অনুগামীদের সামান্য কয়েকটি ছেঁড়াখোড়া অংশ যোগ করা ছাড়া আর কোনো অর্জনের বিষয় অবশিষ্ট ছিল না। অনুগামীদের এই সান্ত্বনা থেকে গেল যে, প্রকৃতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে, সমস্ত বিপদ, রোগ বালাইকে পাশ কাটানো গেছে, জীবন আরো স্বচ্ছন্দ আর আয়েশের হয়েছে এবং তা দ্রুততার সঙ্গে পরিচ্ছন্ন ও অলংকৃত হয়ে এই পৃথিবীতে প্রবহমান। তিন শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দেকার্ত স্পষ্টভাবেই আশাবাদীদের রাজা। তিনি অনুভব করতেন যে, ইতোমধ্যেই তিনি জ্ঞানের সম্ভাব্য সমস্ত ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছেন এবং তাঁর আশা ছিল বাকি জীবনে তিনি অবশিষ্ট কাজটুকু সেরে নিতে পারবেন। এ কাজের জন্য দরকার ছিল অর্থ যা দিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলো সারতে পারতেন এবং ১৬৩৭ সালে প্রকাশিত

https://nagorikpathagar.org

যে চারটি লেখা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তা আর কিছুই না বরং জ্ঞানের জগতে আগ্রহী সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক ইশতেহার, যেন তাঁরা দেকার্তের এই উদ্যোগে অর্থায়ন করেন। তিনি বলেন, 'এখানেই পদ্ধতি, যা আমি অপটিকস, ধাতুবিদ্যা এবং জ্যামিতিতে আবিষ্কার করেছি তার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র এবং এটা প্রমাণ করার জন্যই যে এগুলো আমার হাতে কত সার্থক।'

আপনি যদি আমার উদ্যোগকে অর্থায়ন করেন, আমি আপনাকে একই রকমের সফলতার আস্বাদ দিতে পারি; সম্ভবত এটাই প্রকৃতি এবং মানবজীবনের সুখের চাবিকাঠি এবং এভাবেই *'ডিসকোর্স অন মেথড'* বোঝার জন্য আমরা সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করবো।

'ডিসকোর্স অন মেথড'-এর একটি অংশ নিবেদিত তার পরবর্তী মূল্যবান দর্শনের রূপরেখা বর্ণনায় যার নাম মেডিটেশন অন ফার্স্ট ফিলসফি। আমরা ইতোমধ্যেই তাঁর জ্যামিতির উল্লেখ করেছি যার অবদান অনস্বীকার্য। কারণ, এটা শুধু গণিতের এক নতুন ক্ষেত্রের সূচনা বা আধুনিক গণিতের মূলধারা তৈরিতে নয় বরং গ্রিক সভ্যতার পরে গণিতের জগতে আরো অগ্রসর চিন্তার পথিকৃৎ এবং প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এছাড়াও তা গণিতের সম্ভাবনায় অতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। উপস্থাপন করেছিল সেই ধারণাকে যে, জ্ঞানের যেকোনো ক্ষেত্রের অগ্রযাত্রা সম্ভব হতে পারে জ্ঞানের ইতোমধ্যেই অর্জিত খণ্ডাংশগুলোর একত্রীকরণের মাধ্যমে এবং তা গতির বিশেষণের এক অনুপম মাধ্যম হয়ে উঠল।

দেকার্তের বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো 'ডিসকোর্স অন মেথড', অপটিকস্ এবং আবহবিদ্যায় ছড়িয়ে আছে। দুঃখজনকভাবে ডিসকোর্স অন মেথডে তার যে অংশটুকু অন্তর্ভুক্ত সেটা উল্লিখিত তিনটির মধ্যে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। দেকার্তের অ্যানাটমি যথেষ্ট নির্ভুল কিন্তু শরীরের উত্তাপকে শারীরিক কর্মকাণ্ডের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য দেকার্তকে যথেষ্ট ভুল বোঝা হলেও তাঁর ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়, বরং তা স্টিমইঞ্জিন এবং অন্তর্দহন ইঞ্জিনের ভেতরের দহনকার্যের মূলনীতির পূর্বাভাস দেয়।

অপটিকস্-এ দেকার্তের যে মূল অর্জনগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হচ্ছে আলোর তরঙ্গতত্ত্ব, গতির ভেক্টর বিশেষণ, রিফ্রাকশনের সূত্র, হ্রস্বদৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টির প্রথম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, প্রথম লেন্সের ব্যাখ্যা, প্রথম স্ফেরিকেল বিচ্ছুরণ শনাক্ত করা এবং তা সংশোধনের পদ্ধতি, টেলিস্কোপের আলোক সংগ্রহের ব্যাখ্যা, আইরিস ডায়াফ্রামের নীতি, ড্র-টিউব টেলিস্কোপের

https://nagorikpathagar.org

ফাইভার ও অনুবীক্ষণ এবং প্যারাবোলিক আয়নার সঙ্গে আলোকোজ্জ্বল করার যন্ত্রের ব্যবহার।

আবহবিদ্যায় তাঁর অর্জনগুলো হচ্ছেঃ কোনো ঘটনার ব্যাখ্যায় তিনি স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের ধারণা পরিত্যাগ করেছিলেন। তাপের গতিসূত্র এবং চার্লসের তত্ত্বের পূর্বাভাস, সুনির্দিষ্ট তাপের ধারণায় তিনিই প্রথম বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত, শিশির এবং শিলাবর্ষণের পদ্ধতি ব্যাখ্যার মাধ্যমে আধুনিক আবহবিদ্যার রূপরেখা তৈরি করেন। তিনিই রংধনুর প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি প্রতিফলনের সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেন। তিনি প্রিজমের মাধ্যমে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ হওয়ার বর্ণনা দেন এবং স্লিট স্পেকট্রোস্কোপ নামের এক যন্ত্র তৈরি করেন।

দেকার্ত এবং ধর্ম

দেকার্তের আলোচনায় আমরা আরো একটা মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি হই আর তা হচ্ছে দেকার্ত কতটুকু ধার্মিক ছিলেন? তিনি কি তাঁর সময়ের ক্যাথলিকদের মতো ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন?

উত্তর অত্যন্ত সহজ। দেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রহণ করেছেন, তার অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত দর্শনের ভিত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে শুধু মন এবং বস্তু সৃষ্টিই করেননি বরং তাকে নিরন্তর অস্তিত্বময় রেখেছেন। দেকার্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় মতবাদগুলোকে সাধারণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে এবং গ্যালিলিওর হাইপোথিসিসের ওপর থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেছিলেন যখন তিনি জানলেন 'যাদের বশ্যতা গ্যালিলিও মেনে নিয়েছিলন, তাঁর কাজের ওপরে যাদের কর্তৃত্ব, তাঁর চিন্তার ওপরে নিজস্ব বিচারবুদ্ধির চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়'–তারা তাকে অনুমোদন করেনি।

এর বিপরীত তত্ত্বও আছে, তা হচ্ছে, দেকার্ত মূলত নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। যুক্তির মাধ্যমে তা অন্তত প্রথম ধারণার চেয়ে ভালোভাবে প্রমাণের চেষ্টা করা যাবে। এ তত্ত্ব অনুসারে, দেকার্ত ছিলেন খাঁটি প্রকৃতিবাদী এবং এমন একটা সামাজিক অবস্থায় আবদ্ধ যেখানে বিরুদ্ধবাদীর চরম শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয়। তাঁর শহীদ হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না এবং সে কারণেই তাঁর বিপজ্জনক মতামতগুলোর এক ছদ্মবেশ দিয়েছিলেন আর

https://nagorikpathagar.org

অন্যগুলোকে অলংকৃত করেছিলেন এক ধার্মিকতা দিয়ে, যা এক ধরনের বর্ম হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই কাজটা সফলভাবে সম্পাদনের জন্য তাঁকে নিজের পদ্ধতিতে জোর করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আরোপ করতে হয়েছে, তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মধ্যযুগীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা ধার করতে হয়েছে এবং ঈশ্বরকে এমন সব কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যা দেকার্তীয় দর্শনের মৌলিক তত্ত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এভাবেই ঈশ্বরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, প্রথমত বিশ্বসৃষ্টির, মহাবিশ্বের পরিচালনার সমস্ত নিয়ম তৈরির এবং এই অবস্থান থেকে প্রকৃতিকে তাঁর সৃষ্ট নিয়ম মতো চলার জন্য শুধু সাহায্য করে যাওয়ার। এই নিয়মগুলো ছিল এমনভাবে তর্কাতীত যে, ঈশ্বর যদি একাধিক বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন তবে সেখানেও এমন কোনো বিশ্ব থাকবে না, যেখানে ঈশ্বরের এই নিয়মগুলো পালিত হবে না। দেকার্তের যুক্তির স্বপক্ষে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঈশ্বরের ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই তত্ত্বের প্রথম প্রয়োজনীয় ধাপ হচ্ছেঃ আমি আমার অস্তিত্বকে পরম নিশ্চয়তার সঙ্গে জানি। দ্বিতীয়, যেহেতু আমি অন্তত একটি বিষয় বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে জানতে পারি, তাই জ্ঞানের অবশ্যই একটা পদ্ধতি থাকবে যেখানে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না এবং তার ভিত্তি হবে অবশ্যই ধারণার সুস্পষ্টতা এবং তৃতীয়, যেহেতু আমার বস্তু এবং মনের সুস্পষ্ট ধারণা আছে তাই অবশ্যই তা অস্তিত্বময়। দেকার্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপের মধ্যে এক ধরনের পাদটিকা যুক্ত করে বলতে চান (ক) দ্বিতীয় ধাপটি ভ্রান্ত হতে পারে, যদি বিশ্ব কোনো অশুভ শয়তান পরিচালনা করে; (খ) এক অসীম ঈশ্বর অস্তিত্বময়; এবং (গ) অতএব, অন্যতম পরামর্শ (ক) ভুল এবং মূলতত্ত্বের দ্বিতীয় ধাপটি সুতরাং পুনঃপ্রমাণিত। দেকার্তের যুক্তিতে ঈশ্বরের চরিত্র এবং অবস্থান এই ধারণারই জন্ম দেয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর আলোচনা অবিশ্বস্ত।

উপরন্তু, দেকার্ত যে একজন বিশেষ রকম ভীরু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাঁর লেখাপড়ার সময় সেকথা অনুভব করা যায়। তাঁর বক্তব্য কোনো মানুষকে অসন্তুষ্ট করতে পারে ভাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। একটা কথা বলার পরমুহূর্তেই সেই বিষয়ে উল্টো কথা বলেছেন। দেকার্ত নিজের লেখায় এবং পদ্ধতিতে অভিনবত্ব আরোপ করতে গিয়ে ডিসকোর্সের শুরুতেই এ সমস্যায় পড়েছিলেন। তা না হলে ডিসকোর্স লেখার প্রয়োজনই হতো না।

আমরা আজকে যেমন দেকার্তকে সহজাত সৃজন ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করি, তাঁর সমসাময়িকদের অধিকাংশই তাই মনে করতেন এবং দেকার্ত

https://nagorikpathagar.org

নিজেও স্পষ্টভাবে সেটা মেনে নিতেন। এসব সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট বিনয়ের ভান করেছেন। তাই তাঁর রচনায় সবসময় ছদ্মবিনয় আর দম্ভের কৌতূহলোদ্দীপক সহাবস্থান দেখা যায়। কাউকে অসন্তুষ্ট করার ভয় দেকার্ত যেকোনো লেখকের চেয়ে বেশি পেয়েছেন এবং যতবার তিনি উৎকর্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন ততবারই ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ফলে তার লেখায় পরস্পর-সংলগ্ন প্যারাগ্রাফেই স্ববিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাবে। যা গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিরক্তিকর এবং ডিসকোর্স লেখার উদ্দেশ্যে কমপক্ষে এমন একটি বড় ধরনের স্ববিরোধিতা আছে। ডিসকোর্সের প্রথম অংশে দেকার্ত অনেক বেশি নম্রভাবে নিজের পদ্ধতি আত্মজীবনীর মতো তুলে ধরেছেন; কেননা, এর ভেতরে এমন কিছু উপাদান থাকতে পারে যা পাঠক নিজেই ব্যবহার করতে পারেন। ডিসকোর্সের শেষ অংশে আমরা নম্র শুভারম্ভের এক কৌতূকপূর্ণ উদ্দেশ্য দেখতে পাই।

দ্বিতীয় বিচারের সময় গ্যালিলিও অসফলভাবে সমর্থনের চেষ্টা করেছিলেন এই বলে যে, সত্য নয় বরং সম্ভাব্যতা তার লেখার মূল বিষয়। সেজন্য এটা অসম্ভব নয় যে, দেকার্ত একইভাবে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করবেন এবং তিনি টুকিটাকি বিষয়গুলো সম্পর্কে তাই করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না, তিনি চার্চের মতবাদকে কেন সন্দেহের উর্ধ্বে রাখছেন এবং এমন একটা সময়ে (তৃতীয় অধ্যায়) যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। ঈশ্বর পর্যায়ক্রমে বিশ্বসৃষ্টি করেছেন (পঞ্চম অধ্যায়) তাঁর এই ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার। এমনও হতে পারে যে, তাঁর ঘূর্ণাবর্তের মতো মতবাদ, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের মতো গ্যালিলিওর সর্বনাশ তত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যেন তা চার্চের বিরোধিতার নামান্তর না হয়। এটা করতে গিয়ে তিনি গতির আপেক্ষিকতার মতো প্রাচীন মতবাদ আবিষ্কার করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয় না যে, দেকার্তের ঈশ্বরসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় আসলে দর্শন নয় বরং তা একটি কৌশল।

এ পর্যন্ত যে যুক্তিগুলো আলোচনা করা হলো, সেগুলো ছাড়াও এটা বলা যায় যে, একজন সচেতন পাঠক ডিসকোর্স পড়ে প্রভাবিত হবেন এটাই সম্ভবত সবকিছুর চেয়ে বড় প্রমাণ। দুটো চরম প্রান্তবর্তী অবস্থার মধ্যে যখন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন নয়, সাধারণত তখন অনেকগুলো মতবাদ তৈরি হয়–সাধারণভাবে খ্রিস্টান এবং বিশেষভাবে ক্যাথলিকদের মধ্যে যেখানে দেকার্তের সত্যিকারের প্রত্যয়ের সূত্র বের করার কোনো প্রমাণ নেই। তিনি

https://nagorikpathagar.org

কি মৃত্যুর পরে শাস্তি এবং পুরস্কারের, যীশুর অতি মানবীয় গুণাবলীতে, পুনরুত্থানে অথবা কুমারী মাতাকে বিশ্বাস করতেন? এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণ দিয়ে এ প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর দেয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু অনিশ্চয়তার দুই প্রান্তকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া যায়, যখন দেকার্ত চার্চের অভ্রান্ততার কথা অথবা তাঁর চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারের কথা বলেন, তখন স্তুতিচ্ছলে নিন্দার আভাস চাপা থাকে না যার নিহিতার্থ দেকার্ত যা বলেছেন বা করেছেন তার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ নয়।

অন্যদিকে, প্রায় সমান বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেকার্ত অলৌকিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন; যদিও এই বিশ্বাসের চিহ্ন খুব স্পষ্ট নয় যে, তিনি এই অবস্থানের বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ ছিলেন। একইভাবে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে দেকার্তের বিশ্বাস গ্রহণ করার যথেষ্ট কারণ আমরা খুঁজে পাই।

লরেন্স জে ল্যাফ্লুর

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানে সত্যের সন্ধানে যুক্তির সঠিক প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার পক্ষে যদি এই আলোচনা খুব দীর্ঘ মনে হয়, তবে পাঠক এটাকে ছয়ভাগে ভাগ করে নিয়ে পড়তে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে আছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তা। লেখকের পদ্ধতির মূল সূত্রগুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে তাঁর পদ্ধতি থেকে উৎসারিত নৈতিক নিয়ম। ঈশ্বরের এবং আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে যা তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে পদার্থবিদ্যার কিছু প্রশ্ন, বিশেষ করে হৃদস্পন্দনের ব্যাখ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার কয়েকটা সমস্যা। একই সঙ্গে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর আত্মার পার্থক্য আলোচনা এবং শেষ অধ্যায়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানকে আরো অগ্রসর করার কিছু পূর্বশর্ত। পাশাপাশি এই বইটি লেখার কারণ সম্পর্কে লেখকের ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

বিজ্ঞানের কয়েকটি চিন্তা

বিচারবুদ্ধি মানুষের সবচেয়ে সমবণ্টিত জন্মগত গুণ যা তাকে প্রচুর পরিমাণে দেয়া হয়েছে বলে সকলেই মনে করেন। এমনকি যাদেরকে অন্য কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন তারাও সাধারণত তাদের বর্তমান বিচারবুদ্ধির চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করেন না। বিষয়টা এমন নয় যে, সবাই এ বিষয়ে ভুল করছেন এবং এটা প্রমাণ করে যে প্রত্যেকেরই সঠিকভাবে বিচার করার এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করার ক্ষমতা আছে। এটাই হচ্ছে বিচারবুদ্ধি বা Reason যা প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষের মধ্যে একইরকম। মতের যে ভিন্নতা আমরা দেখি, তা বুদ্ধির ভিন্নতা থেকে হয় না বরং ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার এবং ভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নেয়ার জন্য হয়। সেজন্যই শুধু উন্নত মনই যথেষ্ট নয়, তাকে ভালোভাবে ব্যবহার করাও জরুরি। মহাত্মারা যেসব শ্রেষ্ঠ নৈতিক উৎকর্ষতা (Virtue) উপহার দিতে পারেন, তেমনি করতে পারেন চরম অনৈতিকতারও। তাই যারা দ্রুত ভুল রাস্তায় দৌড়ায় তাদের চেয়ে যারা ধীরে সঠিক পথ ধরে চলেন তাঁরা অনেক দূরে যেতে পারেন।

আমার প্রসঙ্গে বলতে পারি, আমি কখনো মনে করি না যে, আমার মন সাধারণের চেয়ে বিশিষ্ট। বরং আমি সবসময় অন্যদের মতো চপল বুদ্ধিমত্তা, স্বচ্ছ কল্পনাশক্তি বা প্রখর স্মৃতিশক্তি চেয়েছি। আমি আর কোনো গুণের কথা জানি না যা একটা উন্নত মন তৈরি করে। কারণ, একমাত্র যুক্তিই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে পৃথক করেছে এবং আমাদের সকলের মধ্যে তা পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত থাকার জন্য আমি তৃপ্ত। আমি সাধারণত এ বিষয়ে দার্শনিকদের মত অনুসরণ করি, যাঁরা বলেন, একই প্রজাতির পৃথক পৃথক ব্যাস্টিসত্তার আকস্মিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির মধ্যে মাত্রার পার্থক্য আছে, প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের (Essential qualities) মধ্যে নেই।

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, সৌভাগ্যক্রমে যৌবনে কয়েকটি পথে চলতে গিয়ে পতনোন্মুখ হয়েছিলাম। সেটাই আমাকে কয়েকটি বিবেচনার এবং মূল সূত্রের পথ দেখিয়েছে। এ থেকেই আমি এক পদ্ধতি তৈরি করেছি যা আমার গড়পড়তা মেধা এবং সীমিত জীবন সত্ত্বেও আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আমি বিনা বিচারে গ্রহণ করার চেয়ে অবমূল্যায়নের পক্ষপাতি। তা সত্ত্বেও আমার বিবেচনায় আমি ইতোমধ্যেই এই পদ্ধতির ফল পেতে শুরু করেছি। আমার বিশ্বাস, সত্যের সন্ধানে আমি ইতোমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছি এবং এজন্য আমার অপরিসীম তৃপ্তির অনুভূতিকে আমি লুকাতে পারি না। যদিও একজন দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রায় সমস্ত কর্মকাণ্ড নিষ্ফল এবং ব্যর্থ বলে আমার মনে হয়, তা সত্ত্বেও আমি ভবিষ্যতের এই আশায় বুক বাঁধি যদি মানুষ হিসেবে মানুষের একটিমাত্র পেশাও সত্যিকার অর্থে ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়; তবে এটা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট সাহস আছে যে, সেটা আমার এই পেশা যা আমি পছন্দ করেছি।

আমার ভুল হওয়াও সম্ভব এবং আমি হয়তো তামা আর কাঁচকে সোনা আর হীরকখণ্ড বলে ভুল করছি। আমি জানি, আমরা কীভাবে নিজস্ব বিষয়ে ভ্রান্ত বিচার করতে বাধ্য হই এবং আমার বন্ধুদের বিচার কতটুকু অবিশ্বাস করি যখন তা আমার বিপক্ষে যায়। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে আমার পদ্ধতি উপস্থাপন করতে পেরে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত এবং আমার জীবনের একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরবো যেন প্রত্যেকে সে সম্পর্কে তার নিজস্ব মত তৈরি করতে পারে। এইভাবে আমি পাঠকদের মতামতও জানতে পারি এবং আমার পদ্ধতিতে এভাবে অগ্রগতির কিছু যোগ করতে পারবো যা আমি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত।

তাই আমার উদ্দেশ্য এটা বলা নয় যে, সুন্দরভাবে চিন্তা করার জন্য প্রত্যেককে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে বরং এটাই দেখানো যে, নিজের ক্ষেত্রে আমি কীভাবে তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি। যারা অন্যদের উপদেশ দেয়, তারা অবশ্যই উপদেশ গ্রহীতার চেয়ে নিজেদের প্রাজ্ঞ মনে করেন। উপদেশদাতা সূক্ষ্ম বিষয়ে ভুল করলে তাঁদেরকেই দোষ দেয়া উচিত। আমি এই লেখাকে আত্মজীবনী বলে প্রস্তাব করতে চাই অথবা আপনি যদি পছন্দ করেন তবে একটা গল্প হিসেবে, যেখানে কিছু পথনির্দেশের উদাহরণ পেতে পারেন, যা আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। অবশ্য এমন উদাহরণও থাকতে পারে যা অনুসরণ করার

https://nagorikpathagar.org

যৌক্তিকতা নেই। আশা করি তা কারো জন্যে ক্ষতিকর না হয়ে উপকারী হবে এবং সকলে আমার এই অকপটতাকে সদাশয়তার সঙ্গে নেবেন।

শৈশব থেকে আমি বইয়ের জগতের মধ্যে বড় হয়েছি। যেহেতু আমাকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছিল যে বইয়ের মাধ্যমে আমি জীবনের জন্য সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞান স্পষ্ট এবং নিশ্চিতভাবে পাবো, তাই আমি সেগুলো পড়ার জন্য উন্মুখ থাকতোম। কিন্তু আমি যখন আমার পাঠক্রম শেষ করলাম, অর্থাৎ যে অবস্থায় উন্নীত হলে সবাইকে শিক্ষিত বলা হয়, আমার মতামত তখন পুরোপুরি পাল্টে গেল। কেননা, আমি বুঝতে পারলাম এত বেশি পরিমাণ সন্দেহ আর ভুল বোঝার ওপর বসে আছি যে, নিজেকে শিক্ষিত করার চেষ্টায় আমি কতটা অজ্ঞ ছিলাম আবিষ্কার করা ছাড়া আমার কিছুই লাভ হয়নি।

এতদসত্ত্বেও আমি ইউরোপের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্কুলগুলোতে পড়েছি যেসব জায়গায় আমি মনে করতোম জ্ঞানী ব্যক্তিদের থাকা উচিত, যদি আদৌ পৃথিবীর কোথাও জ্ঞানী মানুষ থেকে থাকেন। অন্যরা যা শিখে থাকে সেগুলো সবই আমি শিখেছি এবং জ্ঞানলাভের জন্য যে শিক্ষা আমাকে দেয়া হয়েছে তাতে আমি তৃপ্ত হইনি। যে বইগুলোতে সাধারণ জ্ঞানের বাইরের বিষয় বা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না এমন বিষয় আছে তেমন বইও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি। আমি অন্যদের কাছেও আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা সম্পর্কে জেনেছি। আমি কখনোই আমার সহপাঠীদের তুলনায় খারাপ ছিলাম না, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ অধ্যাপনার পেশা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমার কখনো মনে হয়নি আমাদের সময়টি পূর্ববর্তী যেকোনো সময়ের চাইতে অনুজ্জ্বল কিংবা অনুর্বর। এ সব কিছুই আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সাহায্য করেছে যে, আমি নিজেই অন্যদের মূল্যায়ন করতে পারি এবং এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে সেই প্রজ্ঞা যা আমি এতদিন ধরে খুঁজে পাওয়ার আশা করেছি তা এই পৃথিবীতে নেই।

তবে আমি কখনই স্কুলের শৃঙ্খলার মূল্যকে উপেক্ষা করিনি। আমি জানতাম, যে ভাষাগুলো শিক্ষার্থীরা এখানে শেখে তা পূর্বসূরিদের কাজকে বোঝার জন্য জরুরি এবং উপাদেয় কল্পকাহিনী আমাদের মনকে প্রাণবন্ত করে, ইতিহাসের প্রশংসনীয় কৃতিত্বগুলো মনকে মহৎ করে এবং তা আত্মস্থ করলে মানুষের মূল্যায়নের ক্ষমতা পরিপক্ব হয়। তাই সমস্ত মহৎ বই পড়ার অর্থ অতীতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপচারিতার মতো

https://nagorikpathagar.org

যেখানে লেখকরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলোকে তুলে ধরে, যেখানে আছে, বাকপটুতার অতুলনীয় সৌন্দর্য ও শক্তি, আছে কবিতার মুগ্ধতার আস্বাদ আর মিষ্টতা, আছে গণিতের সূক্ষ্ম নির্ভুল পদ্ধতি যা শুধু কার্য সম্পাদনই করে না পরিশ্রমের প্রয়োজন কমায়, অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক যোগায়। নৈতিকতার সূত্রগুলোতে ন্যায়ের প্রেরণামূলক অনেক কার্যকর সূত্র আছে। ধর্ম শিক্ষা দেয় কীভাবে স্বর্গে যাওয়া যায়, দর্শন সমস্ত সত্যের প্রকাশ সম্পর্কে বলে, এমনকি কিছুটা কম জ্ঞানী লোকদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সাহায্য করে। যারা আইন, চিকিৎসাবিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চা করেন তা তাঁদের জন্য সম্মান ও বৈভব নিয়ে আসে। পরিশেষে এসব কিছুই আবারও পরীক্ষা করা প্রয়োজন; এমনকি ভুল শিক্ষাগুলোকেও, যেন এগুলোর সত্যিকারের মূল্য উদঘাটন করা যায় এবং তা থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাকে এড়ানো যায়।

কিন্তু আমি দেখলাম, আমি ইতোমধ্যেই ভাষা, প্রাচীনদের রচনাবলী, ইতিহাস এবং উপন্যাস পড়ে অনেক সময় ব্যয় করেছি। অগ্রবর্তীদের সঙ্গে কথা বলা আসলে ভ্রমণের মতো। অন্য মানুষদের রীতি-নীতি, জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা খুবই ভালো এ কারণে যে, তার ফলে আমরা নিজস্ব রীতিগুলোকে বস্তুগতভাবে মূল্যায়ন করতে পারি এবং আমাদের রীতিগুলোর সঙ্গে যাদেরটা মেলে না সেগুলোকে অযৌক্তিক এবং হাস্যকর বলার ভুল থেকে বাঁচতে পারি। কিন্তু কেউ যদি সারাক্ষণ ভ্রমণেই ব্যস্ত থাকে তবে নিজের ঘরেই সে আগন্তুক হয়ে পড়ে। একইভাবে কেউ যদি শুধু অতীত সম্পর্কেই উৎসাহী হয়, সে আশ্চর্যরকমভাবে বর্তমান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে ওঠে। এছাড়াও গল্প-উপন্যাস আমাদের ভেতরে কিছু ঘটনার কল্পনা উস্‌কে দেয় এবং বাস্তব জীবনে অসম্ভব বিষয়গুলো সম্ভব বলে মনে করায়। এমনকি পাঠ উপযুক্ত করার জন্য খুব বিশ্বস্ত ইতিহাসেও যদি তা পরিবর্তিত অথবা অলংকৃত নাও হয়ে থাকে, সূক্ষ্ম বিষয় এবং ঘটনাকে এমনভাবে জীবন বইয়ের এসব উদাহরণ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে তারা নাইটদের মতো রোমান্সের স্বেচ্ছাচারে পতিত হয় এবং তাদের সামর্থ্যের বাইরে কাজ করাটাকেও সংগত বলে মনে করে। আমি বাকচাতুর্যকে শ্রদ্ধা করি, কবিতাকেও ভালোবাসি। কিন্তু আমি অনুভব করি এগুলো প্রকৃতির উপহার, গবেষণার ফল নয়।

যারা দৃঢ়তার সঙ্গে তর্ক করে, নিজেদের চিন্তাগুলোকে স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করে, তাদের উচ্চারণ আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট হলেও বা বাগ্মীতার শিক্ষা না থাকলেও অন্যের প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারে।

https://nagorikpathagar.org

যাদের যথার্থ কল্পনাশক্তি আছে এবং চিন্তাকে অনেক মহিমা আর রং দিয়ে প্রকাশ করতে পারে কবিতার শিল্প তাদের অজানা থাকলেও বিখ্যাত কবি হতে তারা ব্যর্থ হয় না।

আমি গণিতের বিষয়ে বিশেষভাবে তৃপ্ত ছিলাম এর নিশ্চয়তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য। কিন্তু আমি গণিতের কোনো উপযোগিতা খুঁজে পাচ্ছিলাম না এবং ভেবেছিলাম যে, তা শুধু যান্ত্রিক শিল্পের জন্য। আমি পরবর্তীকালে বিস্মিত হয়েছিলাম এটা আবষ্কার করে যে, গণিতের চেয়ে মহৎ কোনো কিছুই এত শক্ত এবং দৃঢ় ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে নেই। প্রাচীন পৌত্তলিকদের নৈতিক লেখাগুলোকে আমি কাদামাটি দিয়ে তৈরি কারুকার্যময় প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করি। তাঁরা ন্যায়ের গুণকীর্তন করেছেন এবং ন্যায়কে পৃথিবীর সবচেয়ে কাম্যবস্তু হিসেবে তুলে ধরেছেন কিন্তু ন্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কী সেটা পর্যাপ্তভাবে বলেননি। প্রায়শই এই কথাটি দিয়ে যা বোঝানো হয়, তা হলো বোধহীনতা, পিতৃহত্যা, অহংকার অথবা হতাশা।

আমি আমাদের ধর্মতত্ত্বকে শ্রদ্ধা করেছি এবং অন্য যে কারো মতেই স্বর্গারোহণের প্রত্যাশা করেছি এবং নিশ্চিতভাবে জেনেছি স্বর্গের দ্বার যেমন অজ্ঞের জন্যে তেমনি সর্বজ্ঞানীর জন্যও খোলা। এই সত্যের রহস্যোদঘাটন আমাদের বুদ্ধির ক্ষমতার বাইরে এবং আমি এটাকে আমার যুক্তিবোধের দুর্বলতার কাছে সমর্পণের দুঃসাহসও করতাম না। আমি ভেবেছিলাম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অতিমানব হওয়ার এবং এক অসাধারণ স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে। শুধু এটা ছাড়া আমি দর্শন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলতে চাই না যে, কয়েক শতাব্দী ধরে বিশিষ্ট জ্ঞানীজনেরা সাধনা করে গেছেন এবং উপহার দিয়েছেন এমন কিছু যা সবসময় তর্ক এবং সন্দেহযুক্ত। আমার নিজের সম্পর্কে এমন উঁচু ধারণা অথবা প্রত্যাশা ছিল না যে, অন্যদের চেয়ে এক্ষেত্রে আমার ভালো ফলাফল হবে; যখন আমি জেনেছি যে, একই বিষয় সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষের কত রকমের বিভিন্ন মত থাকে। এটাও ঠিক যে, এগুলোর মধ্যে কখনো একটির বেশি সত্য হতে পারে না। আমি যেকোনো মতামত যা কেবল আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত, সেগুলোকে প্রায় ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করতে থাকলাম।

পরিশেষে যখন জ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রসঙ্গ এলো, আমি বিচার করে দেখলাম যেহেতু এগুলোর মূলনীতি দর্শন থেকে উৎসাহিত, তাই কোনো

https://nagorikpathagar.org

দুর্বল ভিত্তির ওপর কোনো শক্ত কাঠামো তৈরি করা সম্ভব নয়। এই থেকে সম্মান বা অন্য কোনো লাভের সম্ভাবনা নেই, এজন্য আমি এসব পাঠের যৌক্তিকতা দেখি না। সৌভাগ্যক্রমে আমার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে, আমাকে জ্ঞানের পসরা সাজিয়ে বাণিজ্য করতে হবে। যদিও খ্যাতিকে ঘৃণা করার মতো নিন্দাবাদী আমি ছিলাম না। শুধু মিথ্যা ভানের মাধ্যমে যা অর্জন করা যায়, তা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলাম এবং পরিশেষে আমি ভাবলাম, আমি যথেষ্ট পরিমাণে অপ্রশংসিত মতবাদগুলো জেনেছি যেগুলো আলকেমিদের প্রতিশ্রুতির, জ্যোতির্বিদদের ধারণার বা যাদুকরদের প্রতারণা দিয়ে গ্রহণ করার মতো নয় অথবা যারা প্রতারণা ও দম্ভের সঙ্গে কোনো কিছু না জেনেও জ্ঞানী বলে প্রচার করেন তা গ্রহণ করা যায় না।

তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলাম, আমি সম্পূর্ণভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম। সেই জ্ঞান অন্বেষণের সিদ্ধান্ত নিলাম যা আমি নিজের ভেতরে অথবা সম্ভবত প্রকৃতির পাঠশালায় খুঁজে পাবো। আমার বয়ঃসন্ধিকালের কিছু সময় কাটিয়েছিলাম ঘুরে বেড়ানোতে। রাজদরবার, সেনাবাহিনী দেখে নানা বৃত্তির এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় আমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। ভাগ্য আমাকে যে সমস্ত ঘটনা উপহার দিয়েছে সেগুলোকে আমি নিজে পরীক্ষা করেছি। সর্বোপরি আমার চারদিকের সবকিছু নিয়ে ভেবেছি যেন তা থেকে আমি কিছু অর্জন করতে পারি। এজন্য দরকার জ্ঞানীব্যক্তির পাঠকক্ষের আত্মমগ্নতা, শুধু দূরকল্পনায় আগ্রহী, যা নিজের উপরে কোনো প্রভাব ফেলে না কিংবা যার কোনো ফলপ্রাপ্তির আশা সে করে না শুধু এ ক্ষেত্রটি ছাড়া কাণ্ডজ্ঞান থেকে সে যতই দূরে সরে যাবে ততই তার আত্মশ্লাঘায় সুড়সুড়ি দিতে থাকবে। আমার কাছে মনে হলো যে, এসবের চেয়ে আমি আত্মমগ্ন চিন্তায় অনেক বেশি সত্য জানতে পারবো যা প্রত্যেক মানুষই নিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে এসেছে এবং যেখানে ভুল বিচার করলে তার লোকসানের সম্ভাবনা আছে। তখন থেকেই তার প্রয়োজন হয় আরো দক্ষতা আরো বোধবুদ্ধির, যাতে সেগুলোকে আপাত যুক্তিগ্রাহ্য করা যায়। পাশাপাশি আমি সব সময়ই এবং মিথ্যাকে আলাদা করতে উদগ্রীব ছিলাম, যার জন্য এ জীবন সম্পর্কে আমি বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি।

এটা ঠিক যে, যখন আমি কোনো কিছুই না করে মানুষের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করছিলাম, সেখানে তৃপ্তিদায়ক কোনো উপাদানই খুঁজে পাইনি।

https://nagorikpathagar.org

বরং আমি আরো লক্ষ করেছি, ব্যাপক মতভিন্নতা যা এর আগে আমি দার্শনিকদের মধ্যে লক্ষ করেছি। আমার সবচেয়ে বড় লাভ এটাই যে, অন্যান্য মহৎ মানুষেরা গ্রহণ করেছেন, আমি এখন বিভিন্ন ধরনের আচার বা ঐতিহ্যগত প্রথার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, যে আচার-প্রথা আমাদের কাছে অসংযত এবং হাস্যকর মনে হয়। এ থেকে আমি উদাহরণ আর আচার থেকে গৃহীত বিষয়ে আমার শক্ত বিশ্বাস হারালাম। এসব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে ধীরে ধীরে সেই সমস্ত ভুলগুলো থেকে মুক্ত করতে শুরু করলাম যা প্রকৃতির আলোকে আর আমাদের বিচারবুদ্ধিকে অস্পষ্ট করে দিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির বই পড়ে কয়েক বছর ব্যয় করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, নিজেকে জানতে হবে এবং আমার সমস্ত শক্তিকে সঠিক পথ বেছে নেয়ার কাজে ব্যবহার করতে হবে। আমার ক্ষেত্রে তা এক অভাবনীয় ফল নিয়ে এলো। আমি মনে করি, যদি আমি আমার বই আর দেশ ত্যাগ না করতাম তাহলে এই অর্জন কখনো সম্ভব হতো না।

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদ্ধতির প্রধান নিয়মসমূহ

আমি তখন যুদ্ধের কারণে জার্মানিতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। শীত শুরু হওয়ার জন্য রাজার অভিষেক থেকে সেনাবাহিনীতে ফেরার সময় আমি আটকা পড়ে গেলাম। সারা দিন একাকী একটা উষ্ণ ঘরে আবদ্ধ থাকতাম। আলাপে মগ্ন হওয়া বা কোনো আবেগ আর পরিচর্যায় বিব্রত হওয়ার সুযোগ ছিল না। আমার চিন্তাগুলোকে পরীক্ষার জন্য আমার অখণ্ড অবসর ছিল। প্রথমেই আমার মনে যে চিন্তাটি এলো তা হচ্ছে—অনেকে মিলে যে কাজটি করে, তা একক ব্যক্তির কাজের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম নিখুঁত। সে কারণে আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত স্থাপত্য একক স্থপতির হাতে গড়া তা অনেকের হাতের স্পর্শে সম্পূর্ণ অন্য প্রয়োজনে তৈরি করা পুরানো ধ্বংসস্তূপের ওপর পুনর্নির্মিত স্থাপনার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ও সুপরিকল্পিত।

একইভাবে যেসব প্রাচীন নগরীগুলো বাস্তবিকই ছিল ছোট ছোট বসতি। সময়ের বিবর্তনে হয়ে উঠেছে মহানগর এবং সাধারণত খুবই অপরিকল্পিত। বিশেষ করে সেই সমস্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ মহানগরের তুলনায় যেগুলো খোলা জায়গায় নগর পরিকল্পনাকারীরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে তৈরি করেছেন। এটা সত্যি যে, আলাদাভাবে এক এক করে বিচার করলে প্রথম নগরীর স্থাপনা, দ্বিতীয় নগরীর স্থাপনার সমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু কীভাবে এগুলো সুবিন্যস্ত তা যদি লক্ষ করি, এখানে একটা বড় অংশ, আরেক জায়গায় ছোট অংশ এবং রাস্তাগুলো বাঁকা আর অসমান। তা থেকে এটা বলা যায় যে, এই বিন্যাস বরং হয়েছে ঘটনাক্রমে, কোনো যুক্তিবাদী মানুষের চিন্তার ফলে নয়। বিশেষ করে যখন আমরা বিবেচনা করি যে, প্রত্যেকটা স্থাপনার জন্য একজন কর্মকর্তা ছিলেন যাঁর দায়িত্ব ছিল এটা নিশ্চিত করা যে, এই বিশেষ স্থাপনা যেন শহরের সামগ্রিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আমরা তখন বুঝতে পারি অন্যের মনে হয়েছে সমস্ত

https://nagorikpathagar.org

মানুষ প্রথমে আধা বর্বর ছিল; অপরাধ এবং বচসার কুফল আবিষ্কারের পর ক্রমান্বয়ে নিজেদের আইন আবিষ্কারের মাধ্যমে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সভ্য হয়েছে। আধা বর্বরদের চেয়ে যারা আদিকাল থেকেই বিচক্ষণ আইন প্রণেতাদের প্রণীত আইন মেনে চলেছে তারা অনেক বেশি সুশাসিত। তাই সত্যধর্মের যে নিয়মগুলো ঈশ্বর নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে অতুলনীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ হবে তা নিশ্চিত। মানবজাতির বিষয়ে বলতে গেলে, আমি বিশ্বাস করি স্পার্টা একটা বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল এ কারণে নয় যে, তার প্রত্যেকটি আইনই সুন্দর। (এর কিছু আইন ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত এবং নৈতিকতাবিরোধী) বরং এ কারণে যে আইনই তৈরি হয়েছে একক ব্যক্তির হাতে এবং তাদের সবগুলোই একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর দিকে ধাবিত। একইভাবে আমি ভাবলাম, বইপত্রে যে সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয়ের দেখা পাই বিশেষ করে সেইগুলো যা পরীক্ষণের উপরে নয় শুধু যুক্তির উপরে দাড়িয়ে আছে। যা বিভিন্ন জনের মতামতের ক্রমাগত সঞ্চয়ে গড়ে উঠেছে তা কখনোই একক ব্যক্তির গড়ে তোলা সাধারণ যুক্তিবোধের ভিত্তিতে পাওয়া জ্ঞানের চাইতে উত্তম হবে না। একইভাবে আমি মনে করি, পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার আগে আমরা সবাই শিশু ছিলাম। সে সময়ে আমরা আবশ্যিকভাবে জৈবিক ক্ষুধা আর শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে ছিলাম এবং উল্লিখিত প্রভাব দুটোর কোনোটাই পরস্পরের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ নয়। কোনোটাই সম্ভবত নিশ্চিতভাবে আমাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যায় না। তাই আমরা যদি শৈশব থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে গড়ে উঠতাম, তাহলে সে সময়ের বিচারবুদ্ধির তুলনায় আমাদের এখনকার বিচারবুদ্ধি নিখুঁত আর দৃঢ় হবে সেটা আশা করা অসম্ভব।

এটা সত্যি যে, শুধু ভিন্নভাবে তৈরির জন্য বা রাস্তাগুলোকে আরেকটু সৌন্দর্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে আমরা পুরানো সব বাড়িগুলোকে ভেঙে ফেলি না। কিন্তু আমরা এটা দেখি যে, বাড়ির মালিক তাঁর নিজস্ব স্থাপনাকে ভেঙে আবার পুনর্নির্মাণ করেন। এমনকি তারা এটা করতে বাধ্যও হন, যদি দেখা যায় বাড়িটার ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে বা ভেঙে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এই উদাহরণে আমার প্রত্যয় জন্মেছে যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে একটি জাতির সংস্কার সাধনের জন্য তার সমস্ত পুরানো প্রথার পরিবর্তন করে, ধ্বংস করে জ্ঞান এবং শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করে আরেক নতুন কাঠামো সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত নয়। এতদসত্ত্বেও যখন শৈশব থেকে আহরিত জ্ঞান, মতামত প্রভৃতি বিবেচনায়

https://nagorikpathagar.org

এনে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে যদি জীবনে একবার পরিপূর্ণভাবে সবকিছুকে পরিত্যাগ করা যায় এবং পরে তাকে প্রতিস্থাপিত করা যায় উন্নত ধারণা দিয়ে এমনকি পুরানো ধারণাগুলোকে যুক্তির ছাচে আবার করে ঢেলে সাজিয়ে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এভাবেই আমি পুরানো ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আমার আশৈশব আহরিত নীতিগুলো যাচাই না করেই তার ওপরে গড়ে তোলা জীবনের চেয়ে সার্থকতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারবো, যদিও এই পথে কিছু সমস্যা আমি লক্ষ করেছি। সেগুলো গণপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সামান্য সংস্কার করতে গিয়েও যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় তার সঙ্গে তুল্য নয় অথবা অলঙ্ঘ্য নয়। একবার ছুঁড়ে ফেললে বড় অট্টালিকাকে আবার তৈরি করা খুব কঠিন, এমনকি একবার ঝাঁকুনি লাগলে তা সংরক্ষণ করাও খুব কঠিন এবং যখন তা ভেঙ্গে পড়ে তা নিশ্চিতভাবে বিপর্যয়কর। এছাড়াও যদি তাদের অপূর্ণতা বা ত্রুটি থাকে তাহলে আমাদের আচরিত প্রথা দিয়ে ধীরে ধীরে ত্রুটিগুলোকে দূর করে নেই। সম্ভবত প্রথা অনেক বেশি ত্রুটি দূর করার পথ খুঁজে নেয় যা সচেতন পরিকল্পনা দিয়ে মানুষ করতে পারে না। আকস্মিক পরিবর্তনকে মেনে নেয়ার চাইতে অপূর্ণতা বা ত্রুটিকে সাময়িকভাবে মেনে নিয়ে সেটাকে ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করাটা সহজ। ঠিক পাহাড়ের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তার মতো ক্রমাগত ব্যবহারের কারণে সহজে এবং স্বাচ্ছন্দে চলাচল করা যায়। সরাসরি দূরারোহ পর্বতের শিখর থেকে গিরিখাতে ওঠানামার চেয়ে পাহাড়ের স্বাভাবিক আঁকাবাঁকা রাস্তাকে ভালোভাবে অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া সহজ।

সেজন্য আমি সেসব ঝঞ্ঝাটপূর্ণ উৎসাহকে মোটেই অনুমোদন করি না যেগুলো হয় জন্মসূত্রে অথবা কোনোভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়েছে এবং বিরামহীনভাবে কিছু নতুন সংস্কারের প্রস্তাব করছে। এই ডিসকোর্সে যদি সামান্যতম আভাসও পাওয়া যায় যে, এই ভুলের জন্য আমি দোষী; তাহলে এটাকে আমি মুদ্রণের অনুমতি দিতাম না। নিজের ধারণাকে সংস্কার করার বাইরে আমার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না এবং সেগুলোকে এমন এক ভিত্তির ওপরে গড়ে তোলার ইচ্ছে ছিল যা হবে সম্পূর্ণভাবে আমার। যদি আমার ভাবনা আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সন্তুষ্ট করে তবে জনগণের সামনে একটা মডেল উপস্থাপন করবো, এজন্য নয় যে, আমি কাউকে এটা অনুসরণ করার উপদেশ দেবো। ঈশ্বর যাদের উদার হাতে আমার চাইতে অনেক বেশি দিয়েছেন, সন্দেহ নেই যে তাদের উঁচু লক্ষ আছে। আমার ভয় হয়, তাদের জন্য

https://nagorikpathagar.org

আমার পদ্ধতি অতিরিক্ত বিপজ্জনক হতে পারে। এমনকি ইন্দ্রিয় অনুভূত সকল ধারণাকে পরিত্যাগ করার যে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি তা সকলের জন্য অনুসরণীয় নয়। পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে যাদের এটা অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রথমত, যারা নিজেদের সত্যিকারের যোগ্যতার চেয়ে নিজেকে যোগ্য মনে করে, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই বিচার করে এবং কোনো বিষয় নিয়ে চুলচেরা চিন্তা করার মতো ধৈর্য নেই। এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, যখন তারা প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতাকে সন্দেহ করার স্বাধীনতা নেয় এবং সোজা পথ পরিত্যাগ করে, তারা কখনোই সংকীর্ণ পথেও থাকতে পারে না, সরাসরি চলতে হলে যে পথ সবাইকে অবশ্যই নিতে হবে। চিরজীবন ধরে যে পথভ্রষ্ট থেকে যায়। আর দ্বিতীয়, যারা অন্যদের চেয়ে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে কম সক্ষম এবং তাদের সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্য পর্যাপ্ত সংবেদনশীল ও বিনয়ী তারা বরং নিজে সত্যের সন্ধানের চেয়ে অন্যদের মত গ্রহণ করেই তৃপ্ত থাকে।

আমার নিজের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, আমার নিজের কোনো সন্দেহ থাকতো না যে, আমি শেষোক্ত শ্রেণিভুক্ত যদি না আমার মাত্র একজন শিক্ষকের বেশি শিক্ষক না থাকতো অথবা অনেক জ্ঞানী মানুষের মধ্যে সব সময় মতের ভিন্নতা না দেখতাম। কলেজে থাকাকালীন আবিষ্কার করেছিলাম, আমরা আশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্য কোনো জিনিস কল্পনা করতে পারি না। যেমন কিছু দার্শনিক মনে করতেন। নানা দেশ ঘুরে আমি দেখলাম, যাদের মতামত আমাদের ঠিক উল্টো তারা বর্বরও নয়, অর্ধসভ্যও নয়। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের মতোই যুক্তিবাদী। আমি চিন্তা করে দেখলাম, কীভাবে সমপর্যায়ের যুক্তিবাদী একই মানুষ ফরাসি এবং জার্মানদের কাছে একভাবে এবং চাইনিজ বা নরখাদকদের কাছে আরেকভাবে বেড়ে ওঠে। কীভাবে আমাদের চাল-চলন, যা দশ বছর আগে আমাদের তৃপ্ত করেছে এবং আরো দশ বছর পরে করবে, তা এখন আমাদের কাছে অসংযত এবং উদ্ভট মনে হয়? এভাবেই আমি অনুভব করেছি যে আমরা সঠিক জ্ঞানের চেয়ে কিছু প্রথা বা নিদর্শন দিয়ে প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকি। আর যখন তা "সত্য" নির্ণয়ের প্রসঙ্গে আসে তখন দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কোনোভাবেই সত্য নির্ণয় করা যায় না। কারণ একজন ব্যক্তি যত সহজে সত্যের নিকটবর্তী হতে পারেন একটা জনগোষ্ঠী সেটা হতে পারে না। অন্যদিকে আমি এমন কাউকে বেছে নিতে পারিনি যার মতামত আমার কাছে অন্যদের তুলনায়

https://nagorikpathagar.org

গ্রহণযোগ্য। সেজন্য আমি সমস্ত পরীক্ষা নিজে নিজে করতে বাধ্য হয়েছি। তা সত্ত্বেও অন্ধকারে যারা একাকী পথ চলে তাদের মতো ধীরে এবং সতর্কতার সঙ্গে চলার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর ফলে আমি যদি দ্রুত নাও চলতে পারি তবে অন্ততপক্ষে হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচবো। এছাড়াও শৈশব থেকে অযৌক্তিকভাবে যে সমস্ত বিশ্বাস আমার চেতনায় পিছলে ঢুকে পড়েছে সেসব আমি পরিত্যাগ করতে চাইনি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি যে সমস্ত কাজ হাতে নিয়েছিলাম সেগুলো শেষ করার জন্য পরিকল্পনার পর্যাপ্ত সময় এবং আমার মন অনুধাবন করতে পারবে এমন সবকিছুর জ্ঞান লাভ করার সঠিক পদ্ধতি খুঁজে পাই।

যুবক বয়সে দর্শনের শাখাগুলোর মধ্যে আমি যুক্তিবিদ্যা পড়েছিলাম। গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতিক বিশ্লেষণ এবং বীজগণিত–এই তিনটি বিষয় পড়েছি যা আমার চিন্তার কাঠামোতে কিছু না কিছু অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু সেগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম যুক্তিবাদে ন্যায়শাস্ত্রের কিছু বিশেষ পদ্ধতি নতুন জ্ঞান অর্জনের জন্য তেমন ব্যবহার করা হয় না বরং যা আমরা ইতিমধ্যেই জানি তার ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। এমনকি লালীর (ইতালীয় বংশোদ্ভূত ফরাসি অপেরা মিউজিক কম্পোজার) শিল্পের মতো, যা কেউ জানে না সে বিষয়ে মূল্যায়ন না করেই নতুন বিষয় জানার বদলে বক্তব্য দেয়। যদিও লজিকের মধ্যে অনেক সত্য লুকিয়ে থাকে তবে তা অন্য অনেক ক্ষতিকর এবং অনাবশ্যক জিনিসের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, যা বিশুদ্ধ মার্বেল থেকে দেবী ডায়না অথবা মিনার্ভাকে খোদাই করে তৈরি করার মতো কঠিন কাজ। গ্রিকদের জ্যামিতিক বিশ্লেষণ এবং আধুনিক বীজগণিত সেগুলো উপযোগিতাহীন বিমূর্ত বিষয় নিজে কাজ করে, জ্যামিতিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি সীমাবদ্ধ যে, তা আমাদের কল্পনাকে ক্লান্ত না করে উপলব্ধির চর্চা করতে পারে না। এবং বীজগণিত কয়েকটি নিয়ম আর সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হয়ে এমন অস্বচ্ছ এক শিল্পে পরিণত হয়েছে যা বুদ্ধিকে বিজ্ঞানের মতো ঋদ্ধ না করে বিহ্বল করে ফেলে। এর পরিণতিতে আমি ভাবলাম, অন্য কোনো পদ্ধতি অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে, যা এই তিনটি পদ্ধতির সুবিধাগুলোকে একসঙ্গে রেখে ত্রুটিগুলোকে দূর করবে। নিয়মের ভিড় যেমন অধর্মের অজুহাত তৈরি করে এবং রাষ্ট্রের গুটিকয়েক আইন দৃঢ়ভাবে মেনে চললে সুশাসিত হয়, তেমনি আমি ভাবলাম, যুক্তি দিয়ে তৈরি অসংখ্য ন্যায়বাক্যের চেয়ে নিচের চারটি নিয়ম থেকে আমি যথেষ্ট

https://nagorikpathagar.org

উপকৃত হবো যদি আমি দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, অন্তত একবারের জন্যও তা থেকে স্খলিত হবো না।

আমার প্রথম নিয়ম ছিল, কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ না করা যতক্ষণ পর্যন্ত না তা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ, পূর্বধারণা ও অবিমৃষ্যকারিতাকে সতর্কভাবে এড়ানো এবং আমার অনুসিদ্ধান্তে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত না করা, যদি না তা আমার মনে সন্দেহাতীতভাবে এবং স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় নিয়ম ছিল, আমি যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি সেগুলোকে সহজ সমাধানের জন্য যথাসম্ভব খণ্ডে খণ্ডে বিশেষণ করা।

তৃতীয় নিয়ম ছিল, নিয়মতান্ত্রিকভাবে চিন্তা করা। যা বুঝতে সরল ও সহজ সেগুলো দিয়ে শুরু করা ও ক্রমান্বয়ে মাত্রাগতভাবে জটিল জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া। এমনকি কোনো বিষয় আবশ্যিকভাবে সুসংবদ্ধ না হলেও সেভাবে বিবেচনা করা।

শেষ নিয়ম ছিল এমনভাবে বর্ণনাকে সম্পূর্ণ করা এবং পর্যালোচনাকে ব্যাপক করা যেন আমি নিশ্চিত হই যে, কোনো বিষয়ই বাদ পড়েনি।

যুক্তির ওই দীর্ঘ শাখাগুলো এতই সাধারণ ও সহজ যা জ্যামিতিবিদদের অত্যন্ত দুরূহ বিষয় প্রদর্শন করতে সহায়ক হয়েছে; সে কারণে এটা আমাকে ভাবিয়েছে যে, মানুষের জ্ঞাত বিষয়ে যুক্তির সেই একই ধারা কেন প্রযুক্ত হবে না? যদি তাই হয়, তবে আমাদের শুধু যা সত্য নয়, তা সত্য বলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন এবং সতর্কভাবে বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরম্পরাগত যে পদক্ষেপগুলো আছে তা অনুসরণ করে প্রত্যেক বিষয় থেকে অন্য বিষয়গুলো যুক্তিগ্রাহ্য প্রণালীতে বের করে নিতে হবে।

এমন কোনো দুর্বোধ্য প্রস্তাবনা থাকতে পারে না, যা প্রমাণ করা যাবে না অথবা এমন নিগূঢ় কিছু থাকবে না, যা আবিষ্কার করা যাবে না। কোন জায়গা থেকে শুরু করা হবে এ সিদ্ধান্ত নেয়া খুব জটিলও নয়। আমি ইতোমধ্যেই জানি যে, সকলেই শুরু করে সেখান থেকে যা জানা সবচেয়ে সাধারণ এবং সহজ। যাঁরা আগে বিজ্ঞান এবং গণিতে সত্যের সন্ধান করেছেন তাঁদের সকলের মধ্যে শুধু গণিতবিদরা কিছু প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন, কিছু নিশ্চিত ও স্পষ্ট যুক্তি পেয়েছেন। এসব বিবেচনা করে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে, ওরা যেখানে শুরু করেছেন সেখানে

https://nagorikpathagar.org

আমারও শুরু করা উচিত। যদিও মনকে সত্যের সন্ধানে ব্রতী হতে অভ্যস্ত করা এবং দুর্বল যুক্তি দিয়ে প্রভাবিত না হওয়া ছাড়া আমি এতে কোনো বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা করিনি। আমি এটা বলছি না যে, আমি সেই বিশেষ বিজ্ঞান যেমন জ্যোর্তিবিদ্য, সঙ্গীত এবং অপটিকস– যেগুলোকে সাধারণভাবে গাণিতিক বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তার সকল শাখা অনুধাবনের চেষ্টা করেছিলাম। কারণ, আমি দেখলাম যদিও তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু এর শাখাগুলোর ভেতরে বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা পরিমাণের বিষয়ে তাদের বিবেচনার ক্ষেত্রে একই রকম। তাই আমার বিচারে বস্তুর পারস্পরিক অনুপাতের বিষয়কে সাধারণভাবে পরীক্ষা করা উত্তম বলেই আমি স্থির করলাম। বিশেষ বস্তুকে শুধু উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করলাম যেন তাদের মূল সূত্রগুলোকে সহজতর করে এবং ভবিষ্যতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে সেগুলোতে জোর না খাটিয়েই প্রয়োগ করা যায়। পরবর্তীকালে আমি লক্ষ্য করেছি যে, এই অনুপাতগুলি জানতে হলে মাঝে মাঝে তাদের আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং কখনও কখনও শুধু একসাথে অনেকগুলো মনে রাখতে বা বুঝতে হবে; এবং এটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, তাদের আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করার জন্য আমাকে তাদের অন্তর্নিহিত ভাবগুলোর অনুপাত হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, কারণ আমি এর চাইতে সহজ কিছু খুঁজে পাইনি অথবা এমন কিছু পাইনি যা আমার কল্পনা এবং ইন্দ্রিয়গুলোর কাছে আমি আরো পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করতে পারতাম। কিন্তু যখন যৌথভাবে নেয়া হয় তখন মনে রাখা এবং বুঝবার সুবিধার জন্য আমাকে তাদেরকে সংখ্যায় এবং যথাসম্ভব ক্ষুদ্র সংখ্যায় প্রকাশ করতে হয়েছিল। এইভাবে আমি বীজগণিত এবং জ্যামিতির শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে একের পর এক ভ্রান্তির সংশোধন করলাম।

যে কয়টি কর্মবিধি আমি স্থির করেছি তার সঠিক অনুসরণ আমাকে এমন সুবিধা দিল যে, জ্যামিতি ও বীজগণিত বিজ্ঞানের এই দুই শাখার সমস্ত বিষয়ের নিরীক্ষায় আমার মাত্র দুই থেকে তিন মাস সময় লাগল। আমি শুরু করেছিলাম সবচেয়ে সরল এবং সাধারণ বিষয় নিয়ে এবং যে সত্যগুলো আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম তার প্রত্যেকটি ছিল একেকটি নিয়ম যা অন্যগুলোকে খুঁজে পেতে সাহায্য করছিল। এভাবে আমি শুধু অনেক জটিল সমস্যাই সমাধান নয় বরং শেষদিকে বুঝতে পারলাম কতদূর পর্যন্ত কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করে অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমার

https://nagorikpathagar.org

বিশ্বাস, আমাকে আপনাদের চরমভাবে ব্যর্থ বলে মনে হবে না। বিশেষ করে এ বিবেচনায় যে, কোনো একটি সমস্যার একমাত্র একটি সত্যিকারের সমাধান আছে এবং যে সেটা খুঁজে পায় সে তার সম্পর্কে যা কিছু জানা সম্ভব তা জানে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে শিশু পাটিগণিত শিখেছে এবং নিয়ম মেনে যোগ করেছে সে নিশ্চিত বোধ করবে যে, এই বিশেষ গণিতের বিষয়ে মানুষের মন যা যা আবিষ্কার করতে পারে তার সবকিছুই সে খুঁজে পেয়েছে। কারণ, সঠিক ক্রমঅনুসরণের পদ্ধতি এবং সর্বোপরি আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়ের সকল পরিস্থিতির নিখুঁত বর্ণনাই সামগ্রিকভাবে গণিতের নিয়মগুলোকে নিশ্চয়তা দেয়।

এ পদ্ধতির যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে তৃপ্ত করে তা হচ্ছে, এটা আমাকে সকল বিষয়ে যুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা দিয়েছে। খুব নিখুঁতভাবে না হলেও কমপক্ষে আমার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব ততটুকু। পাশপাশি আমি অনুভব করলাম যে, এর চর্চায় আমার মন ক্রমাগত আরো স্পষ্টভাবে বিষয়গুলো কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আমি যেহেতু কোনো বিশেষ বিষয়ে এই পদ্ধতিকে নিবদ্ধ করিনি তাই বীজগণিতে যেভাবে করেছি বিজ্ঞানের অন্য সব সমস্যার সমাধানে সেভাবে সার্থক প্রয়োগ করতে পারবো আমার এই আশাই ছিল। তার মানে এটা নয় যে, আমি একসঙ্গে সমস্ত সমস্যা সমাধানের দুঃসাহস করবো। সেটা করতে গেলে তা আমার অনুসৃত পদ্ধতির নিয়মের বিপরীত হবে। কিন্তু আমি দেখেছি বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো দর্শন থেকে নেয়া হয়েছে যার মধ্যে কোনো নিশ্চয়তা দেয়ার মতো জ্ঞান নেই। সেজন্য এটা মনে হলো যে, আমার প্রথমে দার্শনিক নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। কেননা এটা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে পূর্বধারণা এবং অবিবেচনা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিপদগ্রস্থ করে তুলছে। তাই আমার তৎকালীন চব্বিশ বছর বয়সী অভিজ্ঞতার চেয়ে আরো পরিপক্ব হয়েই উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত। এই প্রস্তুতির অংশত থাকবে আমার ভেতরে জমা হওয়া ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে মনকে মুক্ত করা, অংশত আমার ভেতরে অভিজ্ঞতার এক সঞ্চয় গড়ে তোলা যা ভবিষ্যতে আমার যুক্তির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং অংশত আমার পদ্ধতিতে নিজেকে প্রশিক্ষিত করা যেন এই পদ্ধতির ব্যবহারে আমি ক্রমেই সুদক্ষ হয়ে উঠি।

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

পদ্ধতি থেকে উৎসারিত কিছু নৈতিক নিয়ম

আপনি যেই বাড়িতে বাস করেন সেই বাড়ির পুনর্নির্মাণের জন্য নকশা আঁকা, পুরোনো স্থাপনা ভেঙে ফেলা আর কারিগরদের কাজের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করাটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের অবশ্যই দেখা উচিত যে, নির্মাণ কাজের সময় যেন আমাদের আরেকটি আরামদায়ক বিকল্প আবাস থাকে। একইভাবে আমার নিজের ক্ষেত্রে যখন যুক্তি আমাকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্থির সংকল্প নিতে বাধ্য করেছে সেখানে কোনো কারণ নেই যে, আমার কাজের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটবে না। এই অন্তর্বর্তীকালীন যতটুকু সম্ভব আনন্দে থাকার জন্য আমি নিজের জন্য নৈতিকতার কয়েকটি সূত্র তৈরি করলাম। এর মধ্যে ছিল নিচের তিন বা চারটি সাধারণ নীতি।

প্রথমটি হচ্ছে, দেশের আইন এবং আচার মেনে চলা। পাশাপাশি ধর্মে লগ্ন থাকা যেখানে ঈশ্বরের কৃপায় আমি শৈশব থেকে বেড়ে উঠেছি এবং অন্য সব বিষয়ে যে সমাজে বাস করবো তার বিচক্ষণ অংশের আচার-আচরণে যা দেখতে পাওয়া যায়, সেসবের মধ্যে চরম মতামতগুলো পরিহার করা। তারপর পুনর্বিবেচনার স্বার্থে আমার নিজের মতগুলোকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলাম এবং এই অন্তর্বর্তীকালে সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষগুলোর ওপরে ভরসা করার চেয়ে উত্তম কিছুই নেই। যখন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের মতোই নির্ভরযোগ্য মানুষ পার্সিয়ান অথবা চাইনিজদের মধ্যেও আছেন। তাই এটা সবচেয়ে সার্থক যে, আমি যে সমাজে বাস করবো তার মতো করে আমার আচরণগুলোকে বিন্যস্ত করা। উপরন্তু আমার মনে হয় মানুষের সত্যিকারের মত জানতে হলে মুখের কথার চেয়ে তাদের আচরণে মনোযোগ দেয়া উচিত। শুধু এ কারণে নয় যে, আমাদের এ নষ্ট সময়ের জন্য খুব কমসংখ্যক মানুষই তার অনুভবকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে প্রস্তুত; বরং এ কারণে যে, অনেকেই তার বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন নয়। যেহেতু জানার মানসিক প্রক্রিয়া একটি বিশেষ বিন্যাস এবং আমাদের

https://nagorikpathagar.org

অগোচরেই তা ঘটে যেতে পারে। ব্যাপকভাবে গৃহীত অনেকগুলো মতের মধ্যে আমি গ্রহণ করেছি শুধু কাছাকাছি মাঝারি মতটি। এর আংশিক কারণ হলো, এগুলো সবসময়ই ব্যবহারিকভাবে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সুবিধাজনক। যেহেতু বেশি বেশি সবকিছুই আপাতদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ হলেও উত্তম নয়। কিন্তু একারণেও যে আমি সত্যপথ থেকে কিঞ্চিৎ দূরে থাকবো যদি রাস্তা চিনতে ভুল করেও ফেলি তবে যেন সত্যপথের একেবারে উল্টোপথে চলে না যাই।

বিশেষ করে, যে সমস্ত অতিরিক্ত অঙ্গীকারের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতার কিছু অংশ পরিত্যাগ করি। তার মানে এই নয় যে, আমি অস্থির চিত্তের টলটলায়মান অবস্থানের প্রতিষেধক হিসেবে আইনের প্রয়োজনকে অনুধাবন করি না। আইন হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনের অনুধাবন যা তাদের ইচ্ছার দৃঢ় বাস্তবায়নে বাধ্য করে, যদি সেই ইচ্ছা শুভ হয় বা নিদেনপক্ষে মন্দ না হয়। কিন্তু আমি আগের কোনো বিশ্বাসের কারণে কোনো সামাজিক চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেলাম না। কারণ, আমি জেনেছি কোনো কিছুই অপরিবর্তনীয় নয় এবং আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি আমার মূল্যায়নের ক্ষমতা আরো উন্নত করার প্রস্তাবনা করছিলাম, আরো খারাপ করার জন্য নয়। এটা তখন কাণ্ডজ্ঞানের বড় ধরনের ব্যত্যয় হতো যদি পরবর্তী সময়ে আমার মতকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ফেলার জন্য ইতিমধ্যেই অগ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান বিষয়গুলোকে গ্রহণ করা শুরু করি।

আমার দ্বিতীয় নীতি ছিল যে, আমার কর্মের বিষয়ে যতদূর সম্ভব দৃঢ় এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়া এবং সন্দেহগ্রস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর না হওয়া; যখন আমার সেই সন্দেহগ্রস্থ সিদ্ধান্তগুলো পূর্ণভাবে নিশ্চিত সিদ্ধান্তগুলোর মতো অটল নয়। এ প্রসঙ্গে আমি আমার অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষের মতো করে আচরণ করলাম। ইতস্তত এদিক-সেদিক ঘুরে না বেড়িয়ে কোনো এক নির্দিষ্ট সরলপথ ঠিক করে চলতে শুরু করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো বিশেষ কারণে দিক বদল করতে হয়। এই পদ্ধতিতে যদিও পথের দিক এলোপাতাড়িভাবেই ঠিক করা হয় তবুও তারা একই গন্তব্যে পৌঁছবে বলে ধারণা করা যায়; অবশ্য নিশ্চিতভাবে সেই গন্তব্যই নয় যেখানে তারা পৌঁছবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু নিদেনপক্ষে এমন একটা জায়গায় তারা পৌঁছাবে যা অরণ্যের মাঝে দিকভ্রষ্ট অবস্থার চেয়ে ভালো। একইভাবে আমাদের জীবনে যখন কোনো অপেক্ষার সময় থাকে না এবং যখন আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের চলার শ্রেষ্ঠ পথ স্থির করতে পারি না

https://nagorikpathagar.org

তখন আমাদের সেই পথই বেছে নিতে হয় যেটা 'সম্ভবত শ্রেষ্ঠ' এবং যখন তা আমরা স্থির করতে পারি না তখন আমরা যেকোনো একটা পথ বেছে নেই এবং এমনভাবে সেই পথে চলতে শুরু করি যেন সেই পথটাই নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠ। যদি বেছে নেয়া সেই পথটি ভালো না হয় তবুও যে যুক্তিতে পথটি বেছে নেয়া হয়েছিল সেটা নিঃসন্দেহে ভালো ছিল। মনের এই কাঠামো আমাকে অনুশোচনা থেকে মুক্তি দিল যা সাধারণ অস্থির চিত্তের মানুষেরা অনুভব করে, যারা সব সময় শ্রেষ্ঠ জিনিস খুঁজে বেড়ায় এবং পরে বিচার করে দেখে তা একেবারেই বাজে।

আমার তৃতীয় নীতি ছিল, ভাগ্যের অন্বেষণ নয়, সব সময় নিজেকে জয় করার চেষ্টা করা। প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে আমার ইচ্ছেগুলোকে পরিবর্তন করা এবং সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যে, আমাদের চিন্তা ছাড়া আর কোনো কিছুকেই পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সে কারণে, আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে বাইরের বিষয়ে যা কিছুই করি না কেন, বাকি কাজগুলো সম্পাদন করা একেবারেই অসম্ভব, অন্ততপক্ষে যেখানে আমরা সংশ্লিষ্ট। আমি যে সমস্ত জিনিস অর্জন করতে পারবো না তার প্রত্যাশা থেকে আমাকে এই নীতিই বিরত রাখতে যথেষ্ট যা আমাকে সুখী করবে। কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই আমরা সেই জিনিসগুলো প্রত্যাশা করি, যা আমাদের নাগালের মধ্যে এবং যদি আমরা বাইরের সমস্ত সুবিধাকে একইভাবে নাগালের বাইরে বলে বিবেচনা করি তবে আমরা চীন অথবা মেক্সিকোর রাজা না হতে পারার দুঃখবোধের মতো আমাদের জন্মগত অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবার দুঃখবোধও থাকবে না। এভাবেই মহত্বকে প্রয়োজন হিসেবে তৈরি করা হয়। যেমন প্রবাদ বলে, আমরা যখন অসুস্থ থাকি তখন সুস্থ হওয়ার বদলে হীরকখণ্ডের মতো অবিনশ্বর দেহ চাই না অর্থাৎ বন্দি থাকলে মুক্ত হওয়ার বদলে বিহঙ্গের মতো পাখা চাই না। আমি অবশ্য এটাও স্বীকার করি যে, জগৎ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হলে প্রচুর চর্চা এবং নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন থাকার প্রয়োজন হয়। আমি মনে করি যে, এটাই প্রাচীন দার্শনিকদের প্রধান দক্ষতা ছিল, যাঁরা নিয়তির উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন এবং শত দুঃখ এবং দারিদ্র সত্ত্বেও হাসিমুখে ঈশ্বরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন; প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সব সময় অবগত থেকেও তাঁরা নিখুঁতভাবে প্রত্যয়ী ছিলেন যে, শুধু 'মন' ছাড়া আর কিছুই তাঁদের নিজের নয় এবং শুধু মন অন্য সমস্ত ভয় থেকে তাঁদের মুক্ত রাখতে পারে। মনের ওপরে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ এমন অসীম ছিল যে, তারা

https://nagorikpathagar.org

যৌক্তিকভাবে প্রকৃতি এবং ভাগ্যের সহায়তা পেলেও তাঁদের তুলনায় নিজেদেরকে শক্তিশালী, ঐশ্বর্যময়, মুক্ত আর সুখী ভাবতে পেরেছিলেন।

সবশেষে আমি সমস্ত ধরনের পেশার পর্যালোচনা পরিকল্পনা করেছিলাম যেন তার মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ পেশাকে আমি বেছে নিতে পারি। অন্য পেশাগুলোকে অসম্মান না করেও আমি বলতে পারি আমি বর্তমানে যা করছি অর্থাৎ আমার চেতনার উন্নয়ন এবং যতটুকু সম্ভব সত্যের সন্ধানে আমার পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্ঞানের বৃদ্ধি, এর চেয়ে ভালো কিছু করা সম্ভব ছিল না। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার পর আমি অনন্ত সুখের স্পর্শ পেয়েছি এবং এর চেয়ে নিষ্পাপ আর মহৎ সুখের প্রত্যাশা জীবনে আমি করি না। দিনের পর দিন অন্য সকলের কাছে অপরিচিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সত্য আবিষ্কারে আমি এমনভাবে তৃপ্ত ছিলাম যে, অন্য কোনো বিবেচনা আমাকে ব্যাহত করেনি। আমার এই সিদ্ধান্তের পেছনে আরেকটি কারণ ছিল। যে তিনটি নীতি আমি বিবেচনা করেছিলাম তা আমার সত্যের সন্ধানের পরিকল্পনার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল। কারণ, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমার একবারের জন্যেও অন্যের মতে তৃপ্ত হওয়া উচিত নয় যদি আমি সঠিক সময়ে আমার নিজের বিচার পদ্ধতি ব্যবহারের পরিকল্পনা করি। আমি স্বচ্ছ মনে সেই মতামতগুলোকে অনুসরণ করতে পারি না যদি না আমার এই আশা থাকতো যে, যদি কোথাও সত্য অবস্থান করেও সেই সত্যকে খুঁজে পাওয়ার জন্য সমস্ত সুযোগকে আমি কাজে লাগাবো। এবং পরিশেষে আমি আমার স্বপ্নগুলোকে বেঁধে রাখতে পারছিলাম না, আনন্দিতও হতে পারছিলাম না, যদি না আমি আমার পথে চলতে পারি যে পথে আমি সাধ্য অনুযায়ী সকল জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং সেই একই পথে সমস্ত সত্যিকারের মূল্যবোধ অর্জন করতে পারি যা আমি আকুলভাবে কামনা করছি। পাশাপাশি আমরা কোনো কিছুই চাই না অথবা উপেক্ষা করি না যদি না আমাদের যুক্তি তাকে ভালো বা মন্দ বলে সায় দেয়। উন্নত যুক্তিই উন্নত আচরণের নিশ্চয়তা দেয়। শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করার নিহিতার্থ হচ্ছে যে কেউ সেটা অনুসরণ এবং পালন করতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে যে কেউ সকল উত্তম নীতিবোধ এবং একই সঙ্গে সকল সম্ভাব্য উত্তম বিষয় অর্জন করতে পারে। আমরা একবার এ বিষয়ে নিশ্চিত হলে সুখী হতে ব্যর্থ হবো না।

এই নীতিসমূহের বিষয়ে নিজেকে নিশ্চিত করার পরে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে যা আমার কাজে সব সময়ই ধ্রুব সত্য ছিল, তাকে পাশে সরিয়ে রাখার

https://nagorikpathagar.org

পর আমার প্রতীতি হলো যে, এখন আমি আমার অন্য সমস্ত বিশ্বাসকে বর্জন করতে পারি। যেহেতু আমার আশা ছিল অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে দ্রুততার সঙ্গেই শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবো। তাই যে উষ্ণ নিভৃতিতে বসে এই ভাবনাগুলোর উদয় হয়েছিল, সেখানে আরও বেশি সময় আবদ্ধ থাকার চেয়ে শীত সম্পূর্ণ চলে যাবার আগেই আমি নিজস্ব পথে চলতে শুরু করলাম। এর পরের নয়টি বছর আমি পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। এই রঙ্গমঞ্চে একজন অভিনেতা হওয়ার বদলে একজন দর্শক হয়ে রইলাম। বিশেষ যত্নের সঙ্গে প্রত্যেকটা বিষয়ে অনিশ্চয়তার উপাদান খুঁজতে থাকলাম যা আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

এ সময়ের মধ্যে আমার মনে সঞ্চিত সকল ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করলাম। এই পথে আমার সন্দেহবাদীদের অনুসরণ করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না; যারা শুধু সন্দেহের খাতিরেই সন্দেহ করতো এবং সবসময় অস্থির হয়ে থাকতো। বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল আরো বেশি নিশ্চয়তা অর্জন করা এবং ভঙ্গুর মাটি আর বালুকণাকে বর্জন করে মৃত্তিকা আর পাথরকে আলিঙ্গন করা।

এ সমস্ত বিষয়ে আমি পর্যাপ্ত সাফল্য পেয়েছি বলে মনে হলো। কেননা আমি প্রস্তাবনাগুলোকে দুর্বল অনুমান দিয়ে নয় বরং স্পষ্ট এবং নিশ্চিত যুক্তি দিয়ে অনিশ্চয়তা আর ভ্রান্তির খোঁজ করছিলাম। আমি এমন কোনো অবস্থায় কখনো পড়িনি, যেখানে আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি; এমনকি যদি বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিতও হয়। পুরানো ইমারত ভেঙে সাধারণত তার ধ্বংসাবশেষ আমরা রেখে কেউ নতুন ইমারত গড়ার কাজে সাহায্য করি না। সেইভাবে দুর্বল ছাঁচে তৈরি আমার চিরায়ত ধারণাগুলোকে বর্জন করার প্রক্রিয়ায় আমি বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ করেছি; সেগুলো আমাকে নিশ্চিত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। পাশাপাশি আমি জ্ঞানের এই নতুন পদ্ধতির চর্চা অব্যাহত রাখলাম এবং আমার চিন্তাগুলোকে সেই পথে চালিত করলাম। কিছু সময় আমি বরাদ্দ রাখলাম সময়ে সময়ে গণিতের সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যার চর্চায় ব্যস্ত থাকলাম যেগুলো অপ্রতিষ্ঠিত প্রশ্নে বিজ্ঞানের ধারণাকে বর্জনের মাধ্যমে গণিতের পাশাপাশি চলতে পারে, যা আমি আমার অন্যান্য লেখায় ব্যাখ্যা করেছি। এবং এর ফলে বাহ্যিকভাবে আমার জীবন হয়ে উঠলো তাদের মতো, যাদের স্বচ্ছন্দ এবং নিষ্পাপ

https://nagorikpathagar.org

জীবন কাটানো, কোনো কলঙ্ক ছাড়াই আনন্দ আহরণের চেষ্টা, অবসাদ ছাড়া অবসর কাটানো এবং সমস্ত আনন্দের উপকরণ দিয়ে সময়টাকে পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কিন্তু বাস্তবে আমি কখনোই আমার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিনি এবং সত্যের আরো ব্যাপক সান্নিধ্য লাভ করেছি, তা সম্ভবত শুধু বই পড়ে, যা অক্ষরসর্বস্ব মানুষের সমাজে খুঁজে খুঁজে ফেরার চেয়ে অনেক বেশি।

যাই হোক, জ্ঞানী মানুষের বিভিন্ন মতের সমস্যার বিষয় আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এবং জনপ্রিয় ধারার বিপরীতে আমার সুনিশ্চিত দর্শনের ভিত্তি তৈরি করতে আরো নয়টি বছর কেটে গেল। বেশ কিছু সুদক্ষ মানুষ, যারা আমার আগে এই কাজে হাত দিয়েছিলেন এবং আমার বিবেচনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন; তাদের উদাহরণ আমার মনে এমন তীব্র ভীতির সঞ্চার করলো যে, এই কাজে হাত দেয়ার দুঃসাহস হতো না; যদি না আমি এমন গুজব শুনতাম যে, আমি আমার দর্শনের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ করে ফেলেছি। আমি জানি না এই গুজবের ভিত্তি কী। তবে, যদি আমি আমার কথাবার্তার মাধ্যমে এই ধারণা দিয়ে থাকি তাহলে সেটা হয়েছে স্বল্পজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে সে তুলনায় বেশি খোলাখুলি আমার অজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং সম্ভবত আমার যুক্তিবাদকে সমস্ত রকম সন্দেহের সামনে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য– অন্যেরা যেগুলোকে ধ্রুব সত্য বলে ধরেই নিয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহের জন্য আমার যুক্তি তুলে ধরায়। আমি নিশ্চিত যে, আমি কোনো মতবাদ নিয়ে দম্ভ করিনি। কিন্তু আমি নিজে যতটুকু প্রাজ্ঞ তার চেয়ে বেশি প্রাজ্ঞ হিসেবে চিহ্নিত হতে চাইনি। সেজন্যই আমি ভাবলাম, আমার সর্বশক্তি দিয়ে নিজের সুনামের যোগ্য মর্যাদা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা উচিত। ঠিক আট বছর আগে তাই আমি যে সমস্ত স্থান থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম যা আমার পরিচিতির পরিমণ্ডলের মধ্যেই ছিল। আমি হল্যান্ডে চলে গেলাম, যেখানে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এমন উঁচু মানের অসামরিক শৃঙ্খলা তৈরি করেছিল যে, সৈন্যরা তাদের শুধু শান্তি আর খাদ্যের নিশ্চয়তা পেয়েই সন্তুষ্ট ছিল; মহান এবং ব্যস্ত সমস্ত মানুষের মধ্যে যারা নিজেদের ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারেই উৎসাহী নয়, তাদের চেয়ে নিঃসঙ্গ এবং একাকী এই অনেক দূরের মরুভূমিতে জীবনের সমস্ত আনন্দ আর আরাম খুঁজে পেলাম।

https://nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বর এবং মানবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে, আমার প্রথম গূঢ় চিন্তাগুলোর এখানেই উল্লেখ করবো কি-না। কারণ, সেগুলো এত অধিবিদ্যাসংক্রান্ত আর সাধারণত্বের বাইরে যে, বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তা কৌতূহলোদ্দীপক হবে না। এতদসত্ত্বেও আমার মৌলিক চিন্তাগুলো যে অত্যন্ত স্বচ্ছ সেটা বোঝানোর জন্য আমাকে সেগুলো বলতেই হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে, কখনো কখনো অত্যন্ত অনিশ্চিত মতামতকে এমনভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় যেন তা সন্দেহাতীত। কিন্তু যেহেতু আমি পরিপূর্ণভাবে সত্যের সন্ধানে নিজেকে সমর্পণ করার ইচ্ছা করেছি। আমি ভাবলাম, আমার ঠিক উল্টো পথটাই ধরা উচিত এবং যে বিষয়ে আমার ন্যূনতম সন্দেহ আছে সেটাকেই বর্জন করা উচিত। এই পদ্ধতিতে বিচারের শেষে বা অবশিষ্ট থাকবে সেটাকে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের সবসময় সত্য ধারণা দেয় না, আমি এটা ধরে নিতে তৈরি ছিলাম যে, কোনো কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয় যেভাবে অনুভব করায় তা নয়। এমন অনেকেই আছেন যারা জ্যামিতির সহজতম বিষয়েও যুক্তি ভুল করে, তেমনি অন্যদের মতো আমিও ভুলের ফাঁদে পড়তে পারি। তাই আমি আগে যা যা সত্য বলে গ্রহণ করেছিলাম তা ভ্রান্ত বিবেচনা করে ত্যাগ করলাম। জাগ্রত অবস্থার চিন্তা ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও একইভাবে ঘুমের মধ্যে বিভ্রম বা ভ্রাণ্ড চিন্তা আসতে পারে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার মনে যা কিছুই প্রবেশ করুক না কেন, তাকে স্বপ্নের বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই মনে করবো না। কিন্তু দ্রুতই আমি লক্ষ্য করলাম, যখন সবকিছুতেই ভ্রান্ত বলে চিন্তা করার ইচ্ছা করছি সেই চিন্তাশীল 'আমি' তো একটা কিছু। যেহেতু, 'আমি চিন্তা করতে পারি, তাই আমি অস্তিত্বময়' এই সত্য এত স্পষ্ট এবং নিশ্চিত যে, সন্দেহবাতিকগ্রস্তদের সবচেয়ে অসংযত চিন্তাও একে দ্বিধাগ্রস্ত

https://nagorikpathagar.org

করতে পারে না। আমি ঠিক করলাম, আমি নিরাপদে এটাকে আমার দর্শনের প্রথম নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, যা আমি খুঁজে ফিরছি।

এরপরে আমি আরো সূক্ষ্মভাবে এই 'আমি'-কে বিচার করে দেখলাম যে, আমি কল্পনা করতে পারি–আমি দেহহীন এবং তা এই মহাবিশ্বের কোথাও কোনো স্থান দখল করে নেই; কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারি না যে আমি অস্তিত্বহীন। পক্ষান্তরে, আমি অন্যান্য বিষয়ে সত্যের অবস্থান নিয়ে যখন সন্দেহ প্রকাশ করেছি তখন সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্টভাবে আমার অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়। অন্যভাবে আমি যদি চিন্তা করা বন্ধ করেও দিতাম তবুও আমি যা কিছু কল্পনা করেছিলাম সেগুলো সত্য হয়েই থাকবে। আমি যে সে-সময় অস্তিত্বময় ছিলাম তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ থাকবে না। সে কারণে আমি এই উপসংহারে উপনীত হলাম যে, 'আমি' এমন এক সত্তা যার প্রকৃতিই হচ্ছে চিন্তা করা এবং যার অস্তিত্বের জন্য কোনো স্থান যা বস্তুজগতের আধারের প্রয়োজন নেই। এভাবেই এই মন, এই আত্মা, যার কারণে এই আমি পরিপূর্ণভাবে শরীর থেকে আলাদা। তাই শরীরের চেয়ে মনকে জানা সহজ। এ শরীর যদি নাও থাকে তবে এই আত্মা তার এখনকার অবস্থা থেকে বিচ্যুত হবে না।

এরপরে সাধারণভাবে আমি বিবেচনা করলাম যে, একটি প্রস্তাবনাকে সত্য এবং নিশ্চিত হতে হলে তাতে কী কী থাকতে হবে। কেননা আমি এইমাত্র এমন একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি যা সত্য ও নিশ্চিত। আমি এও ভাবলাম যে, আমাকে অবশ্যই নিশ্চয়তার স্বরূপকেও জানতে হবে। আমি দেখলাম, 'আমি চিন্তা করতে পারি, তাই আমি অস্তিত্বময়' এই বাক্যেরই মধ্যে এমন কোনো উপাদান নেই যা দিয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারি যে, এটা সত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পারলাম যে, চিন্তা করতে হলে কাউকে অবশ্যই অস্তিত্বময় হতে হবে। তাই এই সাধারণ নিয়মকে আমার বিচারে গ্রহণ করতে পারবো এই কারণে যে, যা কিছুই আমরা স্পষ্ট এবং নিশ্চিতভাবে কল্পনা করতে পারি সেগুলো সত্য। কিন্তু এটাকে একটা শক্ত নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। কারণ, কোন কোন বিষয়কে আমরা সেইভাবে কল্পনা করতে পারি তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকতে পারে। তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে সমস্যা থাকতে পারে।

আমি যে শুধুই সন্দেহ করছি, তা বিবেচনা করলে দেখবো যে, এই সন্দেহগ্রস্ততার কারণ হচ্ছে আমার অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ নয়। তাই আমি

https://nagorikpathagar.org

স্পষ্টভাবে দেখলাম, জানার পদ্ধতি সন্দেহ পোষণের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম। আমার চেয়ে শুদ্ধ কোনো কিছুর বিষয়ে আমি কোথা থেকে চিন্তা করতে শিখলাম? সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম? এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, সেই চিন্তা এসেছে আরো শুদ্ধ কোনো প্রকৃতি থেকে। আমার অস্তিত্বের বাইরে আকাশ, পৃথিবী, আলো, তাপ এবং এমন আরো সহস্র জিনিস আছে যে, আমি এসবের উৎপত্তি সম্পর্কে বাস্তবিকই বিব্রত হলাম না। কেননা, এসবের মধ্যে আমি এমন কিছুই খুঁজে পেলাম না, যা আমার আপন প্রকৃতি থেকেই উৎসারিত। কিন্তু সেগুলো যদি অস্তিত্বহীন হয়, তবে আমি বিশ্বাস করতাম তার উদ্ভব শূন্যতা থেকে। অর্থাৎ তারা আমার ত্রুটিগুলো থেকে উদ্ভূত। কিন্তু এটা আমার বর্তমান ধারণাগুলোর চেয়ে আরো বিশুদ্ধ ধারণার ব্যাখ্যা হতে পারে না। শূন্য থেকে উদ্ভূত হওয়া স্পষ্টতই অসম্ভব এবং সুবিবেচকের কাছে শূন্য থেকে জন্ম নেয়ার বিষয়টি কম বিরক্তিকর নয়। তাই আমি ধরে নিতে পারছিলাম না যে, তা আমার মধ্য থেকেই আসছে। এখন বাকি রইলো একটি মাত্র হাইপোথিসিস আর তা হচ্ছে, আমার মনে এই ধারণা এমন এক প্রকৃতি প্রোথিত করেছে, যা আমার চেয়ে বিশুদ্ধতর। আমি কল্পনা করতে পারি এমন সব বিশুদ্ধতার আধার তিনি। এবং এক কথায় তিনি 'ঈশ্বর'। এখানে আমি যোগ করেছিলাম যে, যেহেতু আমি জানি এমন অনেক বিশুদ্ধতা রয়েছে যা আমি ধারণ করি না, আমিই একমাত্র অস্তিত্বময় সত্তা নই (যদি অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দেন তবে এখান থেকে আমার স্কুলের পরিভাষাগুলো স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করবো) এবং এরই যৌক্তিক পরিণতি যে, এমন কেউ বিশুদ্ধতর আছেন যাঁর ওপর আমি নির্ভর করি এবং যাঁর কাছ থেকে আমি আমার সমস্ত বিশুদ্ধতা অর্জন করেছি। কারণ, আমি যদি একক আর সমস্ত কিছু থেকে স্বাধীন হতাম যার ফলে আমাকে আমি সীমিত পরিমাপ মূল্যবোধগুলো দান করতে পারতাম, যেগুলো আমি বিশুদ্ধ সত্তার সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে থাকি, তাহলে আমি আমার মধ্যে যা কিছু কম আছে বলে জেনেছি সবকিছুরই উদ্ধৃতি করতে পারতাম এবং আমি অসীম, অপরিবর্তনীয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান–এককথায় ঈশ্বরের যেসব গুণাবলি আবিষ্কার করতে পারি তার অধিকারী হতাম।

আমার পক্ষে ঈশ্বরের প্রকৃতি যতটুকু জানা সম্ভব তার জন্য আমি এইমাত্র যে যুক্তির ব্যাখ্যা দিলাম, সে অনুসারে শুধু যে একক গুণ সম্পর্কে আমার ধারণা আছে তাই বিবেচনা করেছিলাম এবং মূল্যায়ন করেছি যে, এটা ধারণ করার মতো কোনো বিশুদ্ধ বিষয় কিনা। এভাবেই আমি নিশ্চিত

https://nagorikpathagar.org

হবো যে, যেগুলো সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ নয় তা ঐশ্বরিক নয়। আমি দেখেছি যে সন্দেহ, অস্থিরতা, দুঃখবোধ এবং এ ধরনের বিষয়গুলো ঈশ্বরের প্রকৃতির অংশ হতে পারে না। কারণ, আমার মধ্যে এগুলোর অবস্থান ছাড়াই আমি সুখী হতে পারি। একইসঙ্গে আমার অনেক ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ের ধারণা ছিল; এর কারণ যদিও আমি মনে করতে পারি যে, যা কিছু আমি দেখেছি অথবা কল্পনা করেছি তা মিথ্যা, কিন্তু আমি কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারবো না যে, ধারণাগুলো আমার চেতনাতে নেই। যেহেতু ইতোমধ্যেই আমি খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি যে, বুদ্ধির জগৎ আর ইন্দ্রিয়ের জগৎ পুরোপুরি আলাদা, তাই আমি বিবেচনা করি কোনো একটি জিনিস যদি সরল কোনো উপাদান থেকে তৈরি হয় তাহলে সেই জিনিস তার অস্তিত্বের জন্য অন্য উপাদানের উপরে নির্ভরশীল; এবং এই নির্ভরশীলতার মানেই তো এটা একটা ত্রুটি। এ থেকে আমার প্রতীতি হলো, ঈশ্বর এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির সমন্বয় হতে পারে না এবং তাই তিনি তা নন। কিন্তু যদি এই বিশ্ব প্রকৃতিতে অথবা মননে বা অন্য কোনো প্রকৃতিতে এমন কোনো বিষয় থাকে যা পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ নয়, তবে তাদের অস্তিত্ব অবশ্যই এমনভাবে ঈশ্বরের ক্ষমতায় নির্ভর করে যে, ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁদের অস্তিত্ব থাকতে পারতো না।

এ জায়গায় পৌঁছে আমার অন্য সত্যগুলো অনুসন্ধানের ইচ্ছে হলো এবং জ্যামিতির বিষয়গুলো বিবেচনার পরিকল্পনা করলাম। আমি এটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন বস্তু হিসেবে দেখি অথবা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায় এবং গভীরতায় অসীমভাবে বিস্তৃত একটা Space হিসেবে যাকে নানা আকারে বিশিষ্ট করা যায়, নানা দিকে সরানো যায়, প্রতিস্থাপন করা যায়— সেইভাবে যা জ্যামিতিবিদ ওই বস্তুর বিষয়ে সত্য বলে মনে করেন। আমি কয়েকটি খুব সাধারণ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিচার করে দেখলাম, যে নিশ্চয়তার আখ্যা জ্যামিতিকে দেয়া হয়, তার সবটুকু আগেই আবিষ্কৃত নিয়মগুলোর ওপরে প্রতিষ্ঠিত। আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে, এরমধ্যে আদৌ কিছু নেই, যা ওই বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাকে নিঃসন্দেহ করে। যদি আমরা একটা ত্রিভুজকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করি, এর তিন কোণের সমষ্টি অবশ্যই দুই সমকোণ হবে, কিন্তু এরমধ্যে এমন কোনো সত্য নেই, যা থেকে জানতে পারবো যে পৃথিবীতে 'একটি একক বিশুদ্ধ' ত্রিভুজ আছে। যখন আমি আমার বিশুদ্ধ অস্তিত্বের (ঈশ্বর) ধারণার দিকে ফিরে তাকালাম তখন আবিষ্কার করলাম যে, এটাও ত্রিভুজের তিন কোণের

https://nagorikpathagar.org

সমষ্টি দুই সমকোণ অথবা বৃত্তের সমস্ত অংশই তার কেন্দ্র থেকে সমদূরত্বের নীতির মতো। এভাবেই আমি উপসংহার টানলাম যে, বাস্তবিক অর্থে বিশুদ্ধ সত্তার (ঈশ্বর) অস্তিত্ব জ্যামিতির প্রমাণের মতই স্পষ্ট।

কেন অনেকেই মনে করেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এমনকি নিজের আত্মার প্রকৃতি জানা দুরূহ? কারণ, তাঁরা কখনোই জাগতিক বিষয়ের উর্ধ্বে কিছু চিন্তা করতে পারেন না। যা কিছু আঁকা যায় না বা কল্পনা করা যায় না সেগুলো সম্পর্কে তাঁরা চিন্তা করতে অনভ্যস্ত। এই পদ্ধতি জাগতিক বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য উপযুক্ত। তাই যা কিছু এঁকে দেখানো যায় না, তাঁদের কাছে তা বোধগম্য নয়। এই বিষয়টি আরো প্রতিভাত হয় যখন দার্শনিকেরা শিক্ষাঙ্গনে এটাকে একটা নীতিবাক্য করে ফেলেন এভাবে যে, কোনো কিছুকেই জানা সম্ভব নয়, যদি না তা প্রথমেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। ফলে ঈশ্বর এবং আত্মার ধারণা তৈরি করাটা সমস্যা সংকুল হয়ে পড়ে। ঈন্দ্রিয় স্পষ্টতই এমন একটা বিষয় যেখানে ঈশ্বর বা আত্মার ধারণা কখনোই ছিল না। আমার এটা মনে হয় যারা প্রতিচ্ছবি তৈরি করছেন, তাঁরাও ঠিক একই কাজ করছেন, যেন তাঁরা তাঁদের চোখকে শব্দ শোনার কাজে অথবা গন্ধ শোঁকার কাজে ব্যবহার করছেন। এখানে এমন পার্থক্যও আছে যে, গন্ধ আর শ্রুতি বস্তুর সত্যতা বিষয়ে যতটা নিশ্চয়তা দেয়, দৃষ্টিগ্রাহ্যতা তার চেয়ে কম দেয় না যখন আমাদের কল্পনা অথবা ইন্দ্রিয় কোনোটাই আমাদের হৃদয়ঙ্গম করার শক্তির সহায়তা ছাড়া আমাদের কোনো বিষয়েই নিশ্চিত করতে পারে না।

পরিশেষে, যদি এখনও কেউ থেকে থাকেন, যিনি ঈশ্বর এবং আত্মার অস্তিত্বে আমার ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারছেন না, তাদেরকে আমি ভাবতে বলি, যে সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বে তারা পূর্ণ নিশ্চিত বলে মনে করছেন, যেমন তাঁদের দেহ, অথবা পৃথিবী ও আকাশের তারা, অস্তিত্ব এবং অন্যান্য বিষয়– সেগুলোর অস্তিত্বও কম নিশ্চিত। কারণ, যদিও আমাদের এ বিষয়ে নৈতিক সমর্থন আছে, যেহেতু মনে হয়, সীমালঙ্ঘন না করে তাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করা সম্ভব নয়, তবুও অযৌক্তিক না হয়েও আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না যে, যখন এটা মেটাফিজিক্যাল নিশ্চয়তার প্রশ্ন তখন এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যেমন আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন মনে হয় আমাদের আরেকটি শরীর আছে, আরেকটি পৃথিবী আর অন্য নক্ষত্রমণ্ডলী আছে, যদিও সেগুলো বাস্তব নয়। কীভাবে আমরা জানবো যে, স্বপ্নে আমরা যা

https://nagorikpathagar.org

দেখি তা মিথ্যা, যখন প্রায় সব সময়ই সেগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট আর বিশদ? এই প্রশ্ন নিয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যতক্ষণ খুশি গবেষণা করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি যে, তারা এই সন্দেহ দূর করার মতো কোনো শক্ত কারণ খুঁজে পাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করবে। যে নীতিকে আমি সবকিছু শুরু করার জন্য নিয়ম হিসেবে ধরে নিয়েছি তা হচ্ছে, যে সমস্ত বিষয় আমরা খুব স্পষ্টভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে পারি সেগুলো সত্য, সেগুলো সত্য বলে প্রতিভাত, কেননা ঈশ্বর অস্তিত্বময় এবং যেহেতু তিনি বিশুদ্ধ সত্তা এবং যেহেতু আমাদের ভেতরে সবকিছুই তাঁর থেকে উৎসারিত। এ থেকে এই সিদ্ধান্তই নেয়া যায় যে, আমাদের ধারণা অথবা কল্পনাগুলো সত্য এবং ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো স্পষ্ট আর স্বতন্ত্র এবং সেগুলো কখনোই সত্য হিসেবে প্রতিভাত হতে ব্যর্থ হয় না। যদি কখনো দেখি আমাদের অনেক ধারণার মধ্যে অসত্যের উপাদান আছে তবে, সেই ধারণাগুলো যেখানে দ্বিধা আর অস্পষ্টতা আছে এবং সেগুলো শূন্যতা থেকে উদ্ভুত এগুলো আমাদের ভেতরেই দ্বিধাগ্রস্ত, যেহেতু আমরা পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ নই। এটা স্পষ্ট যে, সুবুদ্ধির কাছে তা মেনে নেয়া অসহনীয় যে, অসত্য আর অবিশুদ্ধতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত এবং সত্য এবং বিশুদ্ধতা শূন্যতা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু যদি আমরা না জানতাম যে, আমাদের ভেতরের সমস্ত বাস্তবতা এবং সত্যগুলো এক বিশুদ্ধ এবং অসীম সত্তা থেকে এসেছে তা যতই স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র হোক না কেন, আমাদের নিশ্চিত হবার কোনো কারণ থাকতো না যে, আমরা সত্য জ্ঞানের জন্য বিশুদ্ধতার আশীর্বাদপুষ্ট।

ঈশ্বর এবং আত্মা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের ফলে আমাদের তৈরি নিয়মগুলো নিশ্চয়তা পায়। এটা বোঝা কঠিন নয় যে, ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা কোনোভাবেই আমাদের জাগ্রত অবস্থার চিন্তার ওপরে সন্দেহের ছায়া ফেলে না। কারণ, যদি এমন হতো যে, আমাদের খুবই স্পষ্ট ধারণা আছে, এমনকি ঘুমের মধ্যেও উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যখন একজন জ্যামিতিবিদ কিছু নতুন প্রমাণের স্বপ্ন দেখেন, তার ঘুম প্রমাণটিকে সত্য হতে বাধাগ্রস্ত করে না। যেহেতু স্বপ্নের সবচেয়ে সাধারণ ত্রুটি হচ্ছে তা বিভিন্ন বস্তুকে এমনভাবে আমাদের মনশ্চক্ষু চিত্রিত করে, যেন আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের সামনে তা প্রতিভাত করছে। বিষয়টা এমন নয় যে, এটা আমাদের ইন্দ্রিয় যে জ্ঞান দেয় তাকে অবিশ্বাস করার উপলক্ষ্য কারণ, আমরা ঘুমিয়ে না থাকলেও ভুল দেখতে পারি। যেমন পাণ্ডুরোগী সবকিছুই হলুদাভ দেখে অথবা তারকাগুলো আসল আকারের তুলনায়

https://nagorikpathagar.org

অনেক ছোট দেখায়। সত্যের বিষয়ে আমরা জেগে থাকি অথবা ঘুমিয়ে থাকি কখনই আমাদের নিশ্চত হওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সেই সত্যের বিষয়ে আমাদের যুক্তিবোধের সমর্থন পাই।

লক্ষ করুন, আমি এখানে যুক্তিবোধ (Reason) বলেছি, আমাদের কল্পনাশক্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের কথা বলিনি। কারণ, যদিও আমরা সূর্যকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখি, এটা ধরে নেয়া অবশ্যই উচিত নয় যে, সূর্যের আকার আমরা যতটুকু দেখি ততটুকুই। এমনকি 'কাইমেরা' (Chimera) নামের পৌরাণিক দানবের অস্তিত্ব পৃথিবীতে না থাকলেও চমৎকারভাবে যার মাথা সিংহের কিন্তু শরীরটা ছাগলের এমন প্রাণীর, কল্পনা করতে পারি। যুক্তিবোধ, আমরা পৃথিবীতে যেভাবে দেখি তাকে সত্য বলে নিতে প্রলুব্ধ বা বাধ্য করে না। কিন্তু এটা বলে যে আমাদের সমস্ত ধারণা বা চিন্তার ভিত্তি হতে হবে 'সত্য'; নয়তো সেই নিখুঁত এবং পরম সত্যের আধার ঈশ্বর তা আমাদের মধ্যে প্রোথিত করতেন না। ঘুমের মধ্যে আমাদের যুক্তিবোধ কখনোই জাগ্রত অবস্থার মতো স্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ নয়, যদিও কখনো আমাদের কল্পনাগুলো জাগ্রত অবস্থার মতোই জীবন্ত এবং নিখুঁত। যেহেতু যুক্তিবোধ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ না হওয়ার জন্য আমাদের সব চিন্তাগুলো সত্য হতে পারে না। তাই আমাদের যে সমস্ত চিন্তার ভেতরে সত্য থাকে সেগুলো অবশ্যম্ভাবীরূপে জাগ্রত অবস্থায় আসে, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নয়।

https://nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

পদার্থবিদ্যার কয়েকটি প্রশ্ন

এই বর্ণনা চালিয়ে যেতে পারলে অথবা যেগুলোকে আমি মূলসূত্র থেকে আবিষ্কার করেছি সেসব সত্যের সবগুলো শৃঙ্খল দেখাতে পারলে তবে সত্যিই খুব আনন্দিত হতাম। কিন্তু সেটা করতে গেলে আমাদের এমন সব প্রশ্নের উল্লেখ করতে হতো যেসব বিজ্ঞজনদের কাছেও অমীমাংসিত। যেহেতু আমি ওদের সঙ্গে এই ঝামেলায় জড়াতে চাই না, তাই ঠিক করলাম যে, এ বিষয় থেকে আমার বিরত থাকাই শ্রেয়। তাই আমি এই দৃষ্টিভঙ্গির শুধু কাঠামোটা উল্লেখ করবো যেন আমার চেয়ে বিজ্ঞজনেরা স্থির করেন যে, এগুলো পুঙ্খানুপঙ্খভাবে আরো ব্যাপকসংখ্যক মানুষকে অবগত করা উচিত কিনা।

আমি যে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি সেটাতেই সবসময় অনুগত থেকেছি। ঈশ্বর এবং আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে এইমাত্র যে নীতি আমি ব্যবহার করলাম এটা ছাড়া অন্য কোনো নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিনি। কোনো কিছুকেই সত্য বলে গ্রহণ করিনি যা আমার কাছে জ্যামিতিবিদদের প্রদর্শিত নিয়মের চেয়েও স্পষ্ট এবং নিশ্চিত বলে মনে হয় না। এ সত্ত্বেও আমি অল্প সময়ের মধ্যেই শুধু দর্শনের মূল সমস্যাগুলোর প্রশ্নে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি তাই নয় বরং ঈশ্বর প্রকৃতিতে যে নিয়মগুলো প্রতিষ্ঠা করেছেন সেগুলোরও কিছু কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছি। যে চিন্তাগুলো তিনি আমাদের মনে প্রোথিত করে দিয়েছেন পর্যাপ্ত গভীর চিন্তার ফলে আমাদের সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে, এই নিয়মগুলো একইভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জায়গায় পালিত হচ্ছে। পরিশেষে এই নিয়মগুলোর নিহিতার্থ বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে, আমি এমন কিছু প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান পেয়েছি যা আমি আগে কখনো জানতে পারিনি, এমনকি জানার আশাও করিনি।

https://nagorikpathagar.org

যেহেতু আমি এই নিয়মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একটি লেখায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি, বিষয়গুলোর কিছু অংশ বিশেষ ও সারবস্তু তুলে ধরার চেয়ে আর ভালোভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়া নেই। লেখা শুরু করার আগে প্রকৃতি এবং বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমি যা কিছু চিন্তা করেছি এবং জেনেছি তা অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা ছিল। আমার অবস্থা হলো সেই চিত্রকরের মতো দ্বিমাত্রিক চিত্রকর্মে ত্রিমাত্রিক ঘনবস্তুর সমস্ত দিক একইভাবে তুলে ধরতে পারে না। তাই একটা দিক আলোর দিকে তুলে ধরে অন্যগুলোকে অন্ধকারের ছায়ায় ফেলে রাখে। ফলে শুধু বেছে নেয়া নির্দিষ্ট দিকটাকেই ভালোভাবে দেখা যায়। সেজন্যেই, এই ডিসকোর্সে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করেছিলাম, সেগুলো পারবো না এই ভয়েই আমি শুধু আলোক সম্পর্কে আমার চিন্তাগুলো পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করার এবং এই সুযোগে সূর্য এবং স্থির নক্ষত্র সম্পর্কে আরো কিছু যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, সূর্য ও স্থির নক্ষত্রগুলোকে আকাশের একমাত্র আলোর উৎস বলা যেতে পারে যেহেতু আকাশের মধ্যদিয়ে তা প্রেরিত হয়। গ্রহমণ্ডলী, ধূমকেতু এবং পৃথিবী সম্পর্কেও কিছু যোগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম, যেহেতু এগুলো থেকে তা প্রতিফলিত হয়। বিশেষভাবে পৃথিবীর সমস্ত এগুলো সম্পর্কে, যেহেতু হয় সেগুলো রঙিন অথবা স্বচ্ছ অথবা উজ্জ্বল এবং পরিশেষে মানুষের সম্পর্কে যেহেতু সে এই সমস্ত কিছুর পর্যবেক্ষক। বরং যেমনভাবে একজন চিত্রকর করে থাকে, আমি আমার বিষয়বস্তুকে কিছুটা অন্ধকারে রেখে দেয়া, যেন আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ বা বর্জন না করেই মুক্তভাবে আমার চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারি। তাই এই বিশ্ব নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়ার দায়িত্ব আমি জ্ঞানী মানুষদের হাতে সমর্পণ করে শুধু এক নতুন বিশ্ব নিয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। যেখানে ঈশ্বর যদি এমন কোনো কল্পিত স্থানে কোনো বিশ্ব এখন সৃষ্টি করতে চান, যদি সেই বিশ্ব সৃষ্টির নিয়ম ছাড়াই উত্তেজিত করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে ফেলেন যা কেবল কবিদের কল্পনাতেই সম্ভব কিন্তু তারপরে আর কিছুই না করে শুধু প্রকৃতিকে সাহায্য করে যান যেখানে তাঁর সৃষ্ট নিয়ম পালিত হওয়ার অনুমোদন থাকবে, তাহলে কি ঘটবে? সেজন্যেই আমি এ বিষয়ে প্রথমেই আলোচনা করেছি এবং এমনভাবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছি যেন ঈশ্বর এবং আত্মার বিষয়ে যা বলেছি তার চেয়ে এই বিশ্বে আর কোনো কিছুই এত স্পষ্ট করে আর বোধগম্য না হয়। এমনকি আমি স্পষ্টভাবে মনে করি যে, এ বিষয়ের কোনো অংশের ব্যাপারেই বা সাধারণভাবে কোনো কিছুর বিষয়েই কেউ বিতর্ক

https://nagorikpathagar.org

করতে পারে, যা আমরা প্রকৃতিগতভাবেই এমনভাবে অবগত হই যে, তা উপেক্ষা করার ভান পর্যন্ত আমরা করতে পারি না। এছাড়াও আমার যুক্তিবোধকে ঈশ্বরের অসীম শুদ্ধতার বাইরে কোনো কিছুর ওপরে স্থাপন না করে প্রকৃতির নিয়মগুলো বিধৃত করেছি।

আমি সেগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যা সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। প্রকৃতি এমনই যে, ঈশ্বর যদি কয়েকটি বিশ্বও সৃষ্টি করতেন তবে সেখানে এমন কোনো বিশ্ব থাকতো না, যেখানে ঈশ্বরের এই নিয়মগুলো পালিত হতো না। এরপর আমি বিবৃত করেছি কীভাবে এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিয়ে পদার্থের বৃহত্তর অংশগুলো এমনভাবে সুসংবদ্ধ হয় যে, তা আমাদের দেখা আকাশের মতো রূপ নেয় এবং কীভাবে কিছু অংশ অবশ্যই একটি পৃথিবী, কয়েকটি গ্রহ, ধূমকেতু, আর কিছু অংশ সূর্য এবং স্থির নক্ষত্রগুলো সৃষ্টি করে। এখানেই আমি অনেকটা স্থান জুড়ে আলোর বিষয়টি বিবৃত করতে গিয়ে এর আওতার মধ্যে সূর্য ও তারকাপুঞ্জের অবস্থানসহ তার প্রকৃতি এবং সেখান থেকে এক নিমিষে আলো কীভাবে স্বর্গের অসীম দূরত্বে পৌঁছে যায় আর গ্রহমণ্ডলী ও ধূমকেতুগুলো থেকে কীভাবে আবার পৃথিবীর দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়, তার ব্যাখ্যা করেছি। এছাড়াও আমি বস্তু ও তার অবস্থান, নড়াচড়া এবং নৈসর্গিক বস্তুসমূহের বহুমুখী গুণাবলী ও তারকারাজি সম্পর্কে কিছু বিষয় যোগ করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, যে বিশ্বের কথা আমি বলছি তার বিষয়ে পর্যাপ্ত কথা বলা হয়েছে। এটা দেখানোর জন্য যে, স্বর্গে ও তারকারাজির মহাকাশে বা আমাদের পৃথিবীতে যা ঘটবে তার অনুরূপ এমন কোনো ঘটনা আমাদের কল্পিত পৃথিবীতে ঘটবে।

এরপর আমি পৃথিবী সম্পর্কে কথা বলেছি, যদিও আমি স্পষ্টভাবে জানি যে, কোনো বস্তু যা দিয়ে তৈরি তাতে ঈশ্বর কোনো ওজন আরোপ করেননি, তবুও কীভাবে তার সমস্ত অংশগুলো কেন্দ্রমুখী হয়? কীভাবে নৈসর্গিক বস্তু এবং নক্ষত্রের, বিশেষ করে চন্দ্রের বিন্যাস জলে জোয়ার-ভাটা এবং বাতাসের সঞ্চালন করে? একইভাবে সমুদ্রের ঢেউ, কিছু বিশেষ স্রোতধারা, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাতাসের গতিপথ নির্ধারিত হয়, যেমনটা আমরা উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে দেখে থাকি। কীভাবে পাহাড়, সাগর. ঝরনাধারা আর নদী স্বচ্ছন্দে তৈরি হয়, খনিতে ধাতুকণা, মাঠে শস্য এবং কীভাবে অনেক ভিন্ন প্রজাতির সমন্বয়ে মিশ্র বস্তু গড়ে ওঠে।

https://nagorikpathagar.org

অন্যান্য বস্তুসমূহের মধ্যে, নক্ষত্রমণ্ডলীর বাইরে আগুন ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব আমি জানি না, যা আলো উৎপাদন করে। তাই আমি আগুনের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি–কীভাবে তা তৈরি হয়, জ্বলতে থাকে। কীভাবে কখনো কখনো তা আলো ছাড়াই উত্তাপ ছড়ায় এবং কখনো কখনো উত্তাপ এর মতো গুণাবলী সৃষ্টি করে। আগুন কীভাবে কিছু কিছু বস্তুকে গলিয়ে ফেলে আর কিছু বস্তুকে শক্ত করে ফেলে, কীভাবে কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে তাকে ধোঁয়া আর ভস্মে পরিণত করে এবং পরিশেষে কীভাবে আগুনের প্রচণ্ডতা দিয়ে ভস্ম থেকে কাচ তৈরি হয়। ভস্ম থেকে কাচের রূপান্তর প্রকৃতির অনেক চমকপ্রদ ঘটনার মতো একটা। তাই এটা ব্যাখ্যা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই।

আমি এসব থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি না যে, আমি যেভাবে প্রস্তাবনা করছি বিশ্ব সেভাবে সৃষ্টি হয়েছে। বরং ঈশ্বর শুরুতে এভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন এটা ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা নিশ্চিত এবং ধর্মতত্ত্ববিদরা সাধারণভাবে এটাই বিশ্বাস করে থাকেন যে, যেভাবে এই বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই একইভাবে তার স্থিতি নিশ্চিত হচ্ছে। এমনকি সেজন্য ঈশ্বর যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশৃঙ্খলা দান করতেন এবং শুধু প্রকৃতির নিয়মগুলোকে প্রতিষ্ঠা করে এই বিশ্ব যেভাবে চলছে সেভাবে চলার জন্য মত দিতেন, তবে সৃষ্টির বিস্ময়ময়তাকে শ্রদ্ধা করেই যে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বস্তু ক্রমান্বয়ে–এখন আমরা বিশ্বকে যেভাবে দেখছি সেই রূপ পরিগ্রহ করবে। এদের প্রকৃতি তখন আত্মস্থ করা সহজ হবে যখন এদের পরিপূর্ণভাবে সৃষ্ট হিসেবে কল্পনা করার চেয়ে বরং সেগুলোর বিবর্তন হয়েছে সেই কল্পনা করতে পারি।

নিষ্প্রাণ জড়বস্তু আর উদ্ভিদের নিরীক্ষা থেকে পরবর্তীকালে আমি তা প্রাণীতে এবং বিশেষভাবে মানুষের নিরীক্ষা শুরু করেছি। কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত মানব শরীর সম্পর্কে এমন কিছু জানি না যে, অন্য বিষয়গুলোকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেই একইভাবে যা এখানেও করতে পারবো, তার অস্তিত্বের কারণ এবং কোথায় কীভাবে প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেছে তা দেখাতে পারবো। তাই আমি এটা ভেবে তৃপ্ত যে, ঈশ্বর আমাদের নিজেদের মতো বাইরের দিক থেকে প্রজাতির অন্যান্য সদস্যের মতো এবং ভেতরে অঙ্গগুলোর বিন্যাসের মতো করেই মানুষের শরীর সৃষ্টি করেছেন। আমি এটাও ধরে নিয়েছি যে, ঈশ্বর শরীরে প্রথমেই নেহাত

https://nagorikpathagar.org

কাঁচা তরকারি হবার জন্য সংবেদনশীল মন অথবা একটি যুক্তিবোধসম্পন্ন আত্মা অথবা অন্য কোনো সত্তা প্রোথিত করে দেন না। বরং হৃদয়ে এমন এক আলো প্রজ্জ্বলিত করে দেন যার কোনো উত্তাপ নেই। এ বিষয়ে আমি কিছুক্ষণ আগেই আলোচনা করেছি। যা শস্যদানাকে শুকিয়ে সঞ্চিত করার আগে উত্তপ্ত করে অথবা যা আঙুর থেকে আলাদা হওয়ার আগে নতুন সোমরসকে গেঁজানোর সময় উষ্ণ করে, তাকে এর সমতুল্য মনে করা যায়। সে সমস্ত বস্তুর কাজগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম, যা কিছুই অস্তিত্বময় হোক না কেন, চিন্তাশীল না হলে সেটাতে আত্মা থাকে না। অন্যান্য বস্তু থেকে এবং আমাদের শরীর থেকেও যা আমাদের বিশিষ্ট করে তা হচ্ছে চিন্তা করার ক্ষমতা, যা আমি আগেও বলেছি। যে শারীরিক কর্মকাণ্ডগুলোর যুক্তিবোধহীন পশুর সঙ্গে সাযুজ্য আছে সেগুলোর মধ্যে চিন্তার কোনো উপাদান নেই, যা শুধু মানুষের মধ্যেই থাকে। এই মানবিক গুণাবলীর বিষয়টি আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি। যখন আমি বিশ্বাস করেছি যে, ঈশ্বর যুক্তিবোধসম্পন্ন আত্মা সৃষ্টি করেছেন এবং শরীরের সঙ্গে তা বিশেষভাবে যুক্ত করেছেন, যা এইমাত্র আমি ব্যাখ্যা করলাম।

আমি এই বিষয়টিকে কীভাবে বিবেচনা করেছি সেটা দেখানোর জন্য আমি বইয়ের এই জায়গায় হৃদপিণ্ডের এবং ধমনীর কাজের ব্যাখ্যা প্রবিষ্ট করালাম। যেহেতু এটাই প্রথম এবং অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান সবচেয়ে সাধারণ কাজ। সে কারণে পাঠক যেন অন্যগুলো সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন। যারা অ্যানাটমি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত নন, তারা যদি আমার বক্তব্য ভালোভাবে বুঝতে চান তবে এটা পড়া শুরু করার আগে সামনে কোনো বড় প্রাণীর এই হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসহ অঙ্গটিকে সামনে নিতে পারেন, যা মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এরপরে হৃৎপিণ্ডের দুটো প্রকোষ্ঠ অথবা অলিন্দ দুটোকে ভালোভাবে দেখা যাক। ডানদিকের প্রথমটাতে দুটো বড় রক্তনালী যুক্ত: Vena cava, যা রক্তের মূল আধার এবং দেখতে অনেকটা গাছের কাণ্ডের মতো, যেখানে অন্যান্য শিরাগুলো তার শাখা-প্রশাখা। Vena arteriosa-এর নামকরণটি ভুল। কারণ বাস্তবিকই এটা একটা ধমনী যা হৃদপিণ্ড থেকে শুরু হয় এবং ফুসফুসের মধ্যে অনেক শাখায় এবং প্রশাখায় বিভক্ত হয়। বাম অলিন্দে একই রকম দুটো রক্তনালী যুক্ত থাকে যা এখনই বিবৃত করলাম। সেরকম Atreriosa venosa আরেকটি ভুল নামকরণ। কারণ এটা ফুসফুস থেকে উদ্ভূত বিশুদ্ধ শিরা, যেখানে এটা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং

https://nagorikpathagar.org

Vena arteriosa-এর সঙ্গে এবং শ্বাসনালীর সঙ্গে যুক্ত হয় যা দিয়ে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নেই এবং মহাধমনী যা হৃদপিণ্ড থেকে শুরু হয়ে তার শাখা-প্রশাখা সমস্ত শরীর বিস্তৃত করে। পাঠককে এখন আমার এগারোটি ছোট পর্দা দেখার জন্য বলা উচিত যেগুলো দেখতে ছোট ছোট কপাটিকার মতো; যেগুলো এর দুই অলিন্দের চারটি মুখের দ্বার খোলে বা বন্ধ করে। তিনটি কপাটিকা Vena cava শুরুর মুখে। সেগুলো বিপরীতমুখীভাবে এমনভাবে বিন্যস্ত যে এর ভেতরে রক্তের যে সঞ্চয় থাকে তা দক্ষিণ অলিন্দে এমনভাবে বিন্যস্ত যে এর ভেতরে রক্তের যে সঞ্চয় থাকে তাকে দক্ষিণ অলিন্দে যেতে দেয় কিন্তু সেগুলোকে আর পেছনে প্রবাহিত হতে দেয় না। তিনটি থাকে Vena arteriosa-এর শুরুর মুখ ঠিক উল্টোভাবে। হৃদপিণ্ডের রক্তকে ফুসফুসে যেতে দেয় কিন্তু উল্টোভাবে ফুসফুস থেকে হৃদপিণ্ডে প্রবাহিত হতে দেয় না। তিনটি মহাধমনীর শুরুর মুখে যা দিয়ে হৃদপিণ্ড থেকে শরীরে রক্ত যেতে দেয় কিন্তু আসতে দেয় না। Arteriosa venosa-এর পর্দা বা কপাটিকার সংখ্যা কেনই-বা দুই সেজন্য কোনো যুক্তি খোঁজার প্রয়োজন নেই, কেননা এর অবস্থান এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি হওয়ার কারণে স্বচ্ছন্দে দুইটি কপাটিকা দিয়েই এই পথ বন্ধ করা যায়। পাঠককে আমার লক্ষ্য করতে বলা উচিত যে, মহাধমনী এবং Vena arteriosa, Arteria venosa Ges Vena cava-এর চেয়ে শক্ত এবং দৃঢ় এবং শেষোক্ত দুটি হৃদপিণ্ডের কাছে এসে স্ফীত হয়ে দুটো থলে Auricle বা হৃদকর্ণ তৈরি করেছে যা দেখতে অনেকটা আমাদের কানের মতো।

এত সব বর্ণনার পরে হৃদপিণ্ডের কাজ ব্যাখ্যা করার জন্য আমার আর কিছুই বলার প্রয়োজন নেই, শুধু সেই ব্যাখ্যা ছাড়া যখন অলিন্দসমূহ রক্ত দিয়ে পূর্ণ থাকে না। সে সময় কিছু অবশ্যই এরমধ্যে প্রবাহিত হয়ে থাকে। দক্ষিণ অলিন্দ Vena cava দিয়ে বাম অলিন্দ Arteria venosa দিয়ে পূর্ণ হয়, যেহেতু এই দুই রক্তবাহী নালী সব সময় পূর্ণ থাকে এবং এদের প্রবেশমুখ হৃদপিণ্ডের দিকে তাই বন্ধ হতে পারে না। অলিন্দের ভেতরে রক্তের পরিমাণ অনেক বেশি হতেই হবে। কেননা এর মুখ অনেক বড় এবং যে রক্তবাহী নালীগুলো অলিন্দে ঢোকে সেগুলো রক্ত দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে। যখনই রক্তের এই অংশ হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে তখনই সেখানকার উত্তাপের প্রভাবে তা লঘু এবং স্ফীত হয়। এটাই সমগ্র হৃদপিণ্ডকে স্ফীত করে তোলে এবং ধাক্কা দিয়ে এই রক্তনালী দুটোর

https://nagorikpathagar.org

পাঁচটি কপাটিকা বন্ধ করে দেয়, যেন যেখান থেকে রক্তগুলো এসেছে সেখান থেকে আর কোনো রক্ত হৃদপিণ্ডে ঢুকতে না পারে। রক্ত যখন আরো প্রসারিত হতে থাকে তখন তা আর ছয়টি ক্ষুদ্র কপাটিকাকে ধাক্কা দিয়ে খুলে দেয়, ফলে আর দুইটি রক্তবাহী নালীর মুখ খুলে যায়, যা দিয়ে রক্ত হৃদপিণ্ডের বাইরে চলে আসে এবং Vena arteriosa ও সকল শাখা এবং উপশাখাকে হৃদপিণ্ডের সঙ্গে সমান তালে প্রসারিত করে। এর পরেই হৃদপিণ্ডের সকল রক্তনালী সংকুচিত হয়, কারণ যে রক্ত প্রবেশ করেছিল তা ইতোমধ্যেই শীতল হয়ে পড়েছে। ছয়টি ক্ষুদ্র কপাটিকা এরপরে বন্ধ হয় এবং Vena cava ও Arteriosa venosa-এর পাঁচটি কপাটিকা আবার খুলে যায়, যেন আর দুই ভাগ রক্ত হৃদপিণ্ড এবং ধমনীতে আগের মতোই প্রবেশ করে তাকে প্রসারিত করতে পারে এবং যেহেতু এই রক্ত নালী দুইটি হৃদকর্ণ হয়ে হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে তা অলিন্দের বিপরীত নিয়ম অনুসরণ করে, যেমন যখন অলিন্দ সংকুচিত হয় তখন হৃদকর্ণ প্রসারিত হয়।

যারা গণিতের মতো যুক্তির প্রদর্শনের শক্তিকে উপেক্ষা করে এবং ভালো ও মন্দ যুক্তির তফাৎকে বুঝতে পারে না, তারা যেন এটা পরীক্ষা না করেই ভ্রান্তির শিকার না হন, আমি অবশ্যই সেই অবশিষ্টদের সর্তক করে দিই। যে গতির ব্যাখ্যা আমি এইমাত্র করলাম তা খালি চোখে হৃদপিণ্ডের যে অংশগুলো দৃষ্টিগোচর হয় তার বিন্যাস, উত্তাপ যা আমরা আঙুলে অনুভব করতে পারি, রক্তের বিশেষ প্রকৃতি যা আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারি অবশ্যই তার ওপরে নির্ভর করে। ঠিক যেমন ঘড়ির গতি তার ওজন, অবস্থা এবং অন্যান্য যন্ত্রের বিন্যাসের ওপরে নির্ভর করে। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, কেন রক্ত হৃদপিণ্ডে ক্রমাগত প্রবাহিত হতে হতে নিঃশেষ হয়ে পড়ে না অথবা ধমনীগুলো অতিমাত্রায় স্ফীত হয়ে ওঠে না– যেহেতু হৃদপিণ্ডের সমস্ত রক্তই একসময় ধমনীতে প্রবাহিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু সেদিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে চাই যা ইতোমধ্যেই একজন ইংরেজ চিকিৎসক লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যিনি এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক দ্বিধা থেকে আমাদের মুক্ত করার গৌরবে গৌরবান্বিত। তিনিই প্রথমে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক ধমনীর শেষাংশে অনেক ক্ষুদ্রাকার নালীকা আছে যা দিয়ে হৃদপিণ্ড থেকে আসা রক্ত ক্ষুদ্র শিরাতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে আবারো হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে। তাই রক্তের প্রবাহ একঅর্থে অনন্ত এবং অবিরাম পরিক্রমা। তিনি শল্যবিদদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে এটা পর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি বাহুতে ঈষৎ

https://nagorikpathagar.org

দৃঢ়ভাবে একটি টুর্নিকেটে দিয়ে তার নিচে শিরা কেটে দেখেছিলেন রক্তপাতের মাত্রা টুর্নিকেট থাকলে অনেক বেশি কিন্তু না থাকলে তা অনেক কম। উল্টোভাবে যখন টুর্নিকেটের উপরে শিরা কাটা হবে তখন রক্তপাতের মাত্রা টুর্নিকেট থাকলে অনেক কম; এমনকি যদি টুর্নিকেটটিকে যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে বাধা হয়ে থাকে তবুও। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ঈষৎ দৃঢ়ভাবেও বাধা টুর্নিকেট বাহুতে যে রক্ত ইতোমধ্যেই ছিল তাকে শিরাপথে হৃদপিণ্ডে ফিরে যেতে বাধা দেয় কিন্তু হৃদপিণ্ড থেকে শিরাতে ধমনীর মাধ্যমে যে রক্ত আসছে তা বন্ধ করতে পারে না। কারণ ধমনী শিরার অনেক নিচে অবস্থান করে এবং ধমনীর দেয়াল শিরার চেয়ে অনেক শক্ত এবং সহজেই তা চাপ দিয়ে বন্ধ করা যায় না। অবশ্য এ কারণেও যে, যখন হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনীতে আসে তখন অনেক বেশি চাপে আসে এবং যখন ফিরে যায় তখন চাপ হ্রাস পায়। যেহেতু রক্ত শিরার একটি মুখ দিয়ে বাহু ত্যাগ করে তাই টুর্নিকেটের নিচে বাহুর দিকে অবশ্যই ধমনী থেকে রক্ত আসার জন্য পথ রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রক্ত প্রবাহের নিজের যুক্তিও ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন শিরার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট পর্দা আছে যা শরীরের মধ্যস্থান থেকে হাতে বা পায়ে রক্ত প্রবাহে বাধা দেয় এবং শুধু হাত বা পা থেকে হৃদপিণ্ডে রক্ত ফিরে যেতে সাহায্য করে। এবং আরো দেখা যায়, যদি শুধু একটা ধমনী কাটা পড়ে এমনকি যদি হৃদপিণ্ডের খুব কাছে টুর্নিকেট বেঁধে তার উপরে কেটে দেয়া যায় তবে শরীরের সমস্ত রক্তই বেরিয়ে আসে। এ থেকেই বোঝা যায় হৃদপিণ্ড ছাড়া আর অন্য কোথাও থেকে রক্ত বেরিয়ে যেতে পারে না।

আরো কয়েকটি বিশেষ বিবেচনা রক্ত প্রবাহের মূল কারণ প্রমাণ করতে পারে। এরমধ্যে একটা হচ্ছে যা আমি এখনই বর্ণনা করলাম। যেমন: প্রথমত, শিরা এবং ধমনীর রক্তের মধ্যে যে তফাত এই তফাত একটা মাত্র কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, আর তা হচ্ছে রক্ত তনুভূত বা লঘু হওয়া যেন তা পরিশুদ্ধ হয়েছে। রক্ত যখন হৃদপিণ্ড অতিক্রম করে ধমনীতে প্রবেশ করে তখন আরো হালকা, আরো সক্রিয়, আরো উষ্ণ হয়। শিরাতে প্রবেশের সময় তা এমন থাকে না। সতর্ক পর্যবেক্ষণে এটা ধরা পড়বে যে, এই পার্থক্য হৃদপিণ্ডের কাছে খুব স্পষ্ট এবং হৃদপিণ্ডের অনেক দূরে এই পার্থক্য প্রায় চোখেই পড়ে না। এরপরে Vena arteriosa থেকে প্রশস্ত যদি না Arteria venosa-এর রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে প্রবাহিত হবোর পরে যদি ফুসফুসে এসে Vena Cava থেকে

https://nagorikpathagar.org

আগত রক্তের চেয়ে আরো দ্রুত হালকাও অনুভূত হয়। এবং চিকিৎসকেরা নাড়ি টিপে কি বলতে পারতো যদি না তারা রক্তের পরিবর্তনের প্রকৃতি জানতো যে রক্ত হৃদপিণ্ডের উত্তাপে আগের চেয়ে প্রবলভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে তনুভূত হয় এবং কীভাবে এই উত্তাপ সারা শরীরে ছড়িয়ে যায় তা যদি আমরা পরীক্ষা করি তাহলে কি আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো না যে, হৃদপিণ্ডের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত রক্তের সংগৃহীত উত্তাপই সারা শরীরে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়? এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যদি শরীরের কোনো অংশে রক্তপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে একই প্রতীকে শরীরের সেই অংশে উত্তাপকেও স্তব্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি হৃদপিণ্ড যদি উত্তপ্ত লোহার মতোও হতো তবুও তা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উষ্ণ করতে পারতো না, যদি না রক্ত অবিরাম সে সমস্ত অঙ্গে প্রবাহিত না হতো। এ সমস্ত পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ অলিন্দে যে রক্ত তনুভূত হয়েছে তাকে বাম অলিন্দে প্রবেশের পূর্বে যে রক্ত প্রায় বাষ্পীভূত হয়েছিল তাকে আবার ঘনীভূত করে। যদি এটা না করা হতো তবে রক্ত হৃদপিণ্ডের আগুনকে পুষ্টি যোগাতে পারতো না। এই বিষয়টি আরো নিশ্চিত হয় যখন আমরা দেখি, যে সমস্ত প্রাণীর ফুসফুস নেই তাদের শুধু একটি অলিন্দ থাকে এবং মাতৃজঠরে শিশু যারা তাদের ফুসফুস ব্যবহার করতে পারে না তাদের একটি ছিদ্র দিয়ে রক্ত সরাসরি Vena cava দিয়ে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এবং আরেকটি নল দিয়ে সরাসরি Vena arteriosa থেকে ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে না গিয়েই মহাধমনীতে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ড তাহলে কীভাবে রক্তকে পাকস্থলীতে পৌঁছে দেয় এবং রক্তের তরল অংশ দিয়ে খাদ্যবস্তুকে দ্রবীভূত করে? যা দিয়ে খাদ্যবস্তুর তরল অংশ রক্তে রূপান্তরিত হয়। এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়, যদি আমরা বিবেচনা করি যে, রক্ত প্রতিদিন শতাধিক অথবা দুই শতাধিক বার হৃদপিণ্ড দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরিশুদ্ধ হয়। আমাদের পুষ্টি ও দেহ-নিঃসৃত রসের উৎপাদন বিষয়ে ব্যাখ্যা করলেই যথেষ্ট; অবশ্য রক্তের চাপের বিষয়টি ছাড়া, রক্ত স্ফীত হয়ে যখন হৃদপিণ্ড থেকে ধমনীর প্রান্তে প্রবাহিত হয় এবং আগেই অবস্থিত রক্তকে প্রতিস্থাপন করে রক্ত অঙ্গসমূহে অবস্থান করে এবং এই রক্তের কিয়দাংশ অন্যান্য অংশের চেয়ে শরীরের কিছু অঙ্গে সেই অঙ্গের বিশেষ অবস্থান আকার অনুসারে স্থিত হয়ে বিশ্রাম পায়। ঠিক যেমনটি চালুনির বিভিন্ন মাপের ফুটোর মতো যা দিয়ে বিভিন্ন আকারের শস্যদানাকে আলাদা করা যায়। সবচেয়ে উলেখযোগ্য বিষয়

https://nagorikpathagar.org

হলো রক্ত থেকে প্রাণীর আত্মার উদ্ভব, যা কিনা খুবই মৃদু হাওয়ার মতো অথবা পরম বিশুদ্ধ এবং প্রাণবন্ত শিখার মতো যা অবিশ্রান্তভাবে হৃদপিণ্ড থেকে মস্তিষ্কে পর্যাপ্তভাবে উত্থিত হয় এবং তারপরে স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পেশীতে সঞ্চালিত হয়, যা দিয়ে শরীরের সকল গতি সৃষ্টি হয়। রক্তের সবচেয়ে অস্থির এবং তীক্ষ্ণ অংশই প্রাণীর আত্মা তৈরি করে এবং এই অংশ কেন অন্য অঙ্গের দিকে না গিয়ে মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয় তা বোঝার জন্য অন্য কোনো কারণ অন্বেষণের প্রয়োজন নেই। কেননা, মস্তিষ্কগামী ধমনীগুলোই সবচেয়ে সরল এবং ঋজু। যা প্রকৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বলবিদ্যার সূত্র অনুসারে যখন কয়েকটি বস্তু একই সঙ্গে একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয় কিন্তু যখন সেইস্থানে সব বস্তুর পর্যাপ্ত স্থান নেই, তখন সবচেয়ে দুর্বল এবং অপেক্ষাকৃত কম অস্থির অংশটি সরল অংশের পাশে সরে যাবে, যে সরল অংশটিই শুধু সে কারণে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে–সেই একইভাবে যখন রক্ত বাম অলিন্দ ত্যাগ করে মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয় এবং তখন তার তীক্ষ্ণ অংশই মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

আমি এ সমস্ত বিষয়ই আমার মূলসূত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলাম, যা আমি অনেক আগেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। আমি দেখিয়েছি কীভাবে স্নায়ু এবং পেশীর পারস্পরিক যোগাযোগ প্রাণীর আত্মাকে গতিশীল রাখে, যেভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারবো যে, কর্তিত মস্তক কীভাবে নড়াচড়া করে বা মাটি কামড়িয়ে ধরে, যখন তা মোটেও জীবিত নয়। আমি দেখিয়েছি নিদ্রা, স্বপ্ন এবং জাগরণের জন্য মস্তিষ্কে কী কী পরিবর্তন অবশ্যই ঘটতে হবে। কীভাবে আলো, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, উত্তাপ এবং বস্তুর অন্যান্য গুণাবলী ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নানা ধারণা প্রোথিত করতে পারে এবং কীভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ আবেগের বার্তা পৌঁছে যায়। আমি ব্যাখ্যা করেছি যে, প্রাণীর ইন্দ্রিয়কে যা এই সমস্ত ধারণা গ্রহণ করে তাকে অবশ্যই কি বুঝতে হবে, স্মৃতি দিয়ে যা ধারণ করে রাখে এবং কল্পনা দিয়ে যা নানাভাবে ধারণাকে পরিবর্তিত করতে পারে এবং নতুন ধারণা তৈরি করতে পারে। এইভাবে বস্তুর উপস্থিতিতে ইন্দ্রিয় এবং আবেগের মাধ্যমে আত্মাকে মানুষের পেশীতে সঞ্চালিত করে, অঙ্গ সঞ্চালিত করে এমনভাবে যা আমাদের শরীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সহস্র রকমভাবে আত্মাকে সঞ্চালিত করতে পারে। এটা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হবে না, যারা জানে মানবসভ্যতা এবং বর্তমান শিল্পায়ন কত ধরনের যন্ত্র তৈরিতে পারঙ্গম যদিও এ সব যন্ত্রাদি মানুষের অস্থি, পেশী এবং স্নায়ুতন্ত্রের তুলনায় সামান্য কয়েকটি যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি। তারা মানব

https://nagorikpathagar.org

শরীরকে ঈশ্বরসৃষ্ট একটি যন্ত্র হিসেবে দেখবে এবং যা অতুলনীয়ভাবে উন্নত নকশায় তৈরি এবং মনুষ্যসৃষ্ট যেকোনো যন্ত্রের চেয়ে স্বচ্ছন্দ এবং প্রশংসনীয়ভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে পারঙ্গম। এখানে আমি বিরতি দিয়েছি এটা দেখানোর জন্য যদি এমন কোনো যন্ত্র থাকতো, যার অঙ্গাদি এবং বহিরঙ্গ বানরের মতো অথবা অন্য কোনো যুক্তিবোধহীন প্রাণীর মতো, আমাদের এটা বলার কোনো উপায় থাকতো না যে, এটার প্রকৃতি ওইসব প্রাণীর মতো নয়। কিন্তু যদি এমন কোনো যন্ত্র থাকতো যা আমাদের শরীরের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা এবং আমাদের কর্মকাণ্ড অনুকরণ করতে সক্ষম, তবে সেখানে এমন কোনো পরম পদ্ধতিও থাকতো যা নিশ্চিতভাবেই শনাক্ত করতে পারতো যে, এটা সত্যিকারের মানুষ নয়। প্রথমত, তা কখনো ভাবপ্রকাশের জন্য আমাদের মতো শব্দ অথবা কোনো সংকেত ব্যবহার করতে পারবে না। এটা অবশ্য কল্পনা করা যায় যে, এমন যন্ত্র তৈরি করা যায়, যা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে এবং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবভঙ্গিও করতে পারে। যেমনঃ উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, এর কোনো স্থানে স্পর্শ করলে হয়তো যন্ত্রটা জানতে চাইবে, আমরা কী বলতে চাই। অন্যস্থানে স্পর্শ করলে এমনভাবে চিৎকার করবে যেন মনে হবে যে, সেটা ব্যথা পেয়েছে। কিংবা এ ধরনের সাধারণ অনুভূতিগুলো থাকতে পারে। কিন্তু তা কখনো এর তৈরি বাক্যমালাকে পরিবর্তন করে যা বলা হয়েছে তার মূলভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উত্তর তৈরি করতে পারবে না, যা কিনা সবচেয়ে নির্বোধ লোকটিও পারবে। শনাক্তকরণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, যদিও এই যন্ত্রগুলো নানা ধরনের কাজ করতে সক্ষম। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের চেয়েও ভালোভাবে করতে সক্ষম। তবুও তারা অভ্রান্তভাবে কিছু বিষয়ে অক্ষম থাকবে, যার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করতে পারবো যে, এই যন্ত্রগুলো বিষয়টা বুঝে তা নিয়ে কাজ করছে না, বরং শুধু অঙ্গসমূহের বিশেষ বিন্যাসের কারণে সেই কাজগুলো করতে পারছি। তাই একটা সার্বজনীন যন্ত্র, যা সমস্ত অবস্থায় ব্যবহার করা যায়, অঙ্গসমূহকে কোনো বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিন্যাসে সাজানো হয় তবুও হবে এ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে—বস্তুত এটা অসম্ভব যে, যন্ত্রের ভেতরে পর্যাপ্ত যন্ত্রাংশ উপস্থিত থাকলেও জীবনের সমস্ত বিচিত্র ঘটনায় আমাদের যুক্তিবোধ যেভাবে আমাদের চালিত করে সেভাবেই যন্ত্রও চলবে।

এই দুই পদ্ধতি থেকে আমরা মানুষ এবং প্রাণীর পার্থক্যও শনাক্ত করতে পারি। যেমনঃ এটা লক্ষণীয় যে, এমন কোনো মানুষ নেই, এমনকি

https://nagorikpathagar.org

উন্মাদের মধ্যেও, যারা এমন নির্বোধ এবং বুদ্ধিহীন যে মনের ভাব প্রকাশের জন্য শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি করতে পারে না। উল্টোভাবে এমন কোনো নিখুঁত সৌভাগ্যবান প্রাণী নেই, যে সেই একই কাজ করতে পারে। এ কারণে নয় যে, তাদের কোনো অঙ্গের ঘাটতি আছে, যেমন : আমরা দেখতে পাই যে, ম্যাগপাই এবং তোতাপাখি আমাদের মতোই শব্দ উচ্চারণ করতে পারে, তা সত্ত্বেও আমাদের মতো কথা বলতে পারে না, যা থেকে বোঝা যেতে পারতো যে, তারা এটা চিন্তা করে বলছে। অন্যদিকে যারা জন্ম থেকে মূক এবং বধির এবং বলা যেতে পারে মনুষ্যত্বের প্রাণীদের মতোই যাদের কথা বলার অঙ্গগুলো থাকে না, তখনও তারা কিছু চিহ্ন আবিষ্কার করে, যা দিয়ে নিজেদের অনুভূতিকে তাদের ভাষা যারা বুঝতে সক্ষম, তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়। এবং এটাই কি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করে না যে, পশুদের মানুষের চেয়ে বিচারবুদ্ধি কম থকে, বরং আদৌ বিচার বুদ্ধি নেই যখন আমরা দেখি যে, কথা বলার জন্য সামান্য বিচারবুদ্ধিই প্রয়োজন হয়। এছাড়াও আমরা দেখি, মানুষের মতোই একই প্রজাতির প্রাণীর মধ্যেও ভিন্নতা আছে এবং কাউকে কাউকে অন্যদের চেয়ে সহজে প্রশিক্ষিত করা যায়। তাই এটা অবিশ্বাস্য যে, একটা বানর অথবা তোতাপাখি যা তার নিজস্ব প্রজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তা একজন নির্বোধ শিশু অথবা দুর্বল শিশুর সমতুল্য হবে যদি না তাদের আত্মার প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে এক হয় ।

এটাও লক্ষ্য করা উচিত যেন আমরা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে অনুভূতি প্রকাশের সহজাত নড়াচড়াকে গুলিয়ে না ফেলি। এগুলো যন্ত্র এবং অন্যান্য প্রাণী অনুকরণ করতে সক্ষম। কিছু কিছু প্রাচীনদের মতো আমাদের এটাও চিন্তা করা উচিত নয় যে, পশু-পাখিরাও কথা বলে কিন্তু আমরা তাদের ভাষা বুঝতে পারি না। কেননা, যদি এটা সত্য হতো তবে তারা আমাদের এবং তাদের সমগোত্রীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করতো, যেহেতু তাদেরও আমাদের মতোই বেশ কয়েকটি অঙ্গ আছে। এটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, যদিও কোনো কোনো প্রাণীর বিশেষ আচরণে আমাদের চেয়েও বেশি শ্রমশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই একই প্রাণী অন্য বিষয়ে আদৌ তা প্রকাশ করে না; তাই যদিও তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে কোনো কিছু উত্তমভাবে করে তবুও এটা প্রমাণ করে না যে, তারা আমাদের চেয়ে বেশি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হবে এই যুক্তিতে যে, তারা আমাদের যে কারোর চেয়ে অধিক যৌক্তিক প্রাণী হবে এবং আমাদের সব ক্ষেত্রেই অতিক্রম করে যাবে। উল্টোভাবে এটাই

https://nagorikpathagar.org

প্রমাণ করে যে, তারা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী নয় এবং তাদের অঙ্গ সংস্থানের প্রকৃতিই তাদের আচরণ কেমন হবে তা স্থির করে দেয়; ঠিক যেমনটি চাকা স্প্রিং দিয়ে তৈরি একটা ঘড়ি, যা আমাদের বুদ্ধিমত্তার চেয়েও নিখুঁতভাবে সময় গুনে চলে।

এরপরে আমি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার বর্ণনা দিয়েছি এবং এটা দেখিয়েছি যে, সম্ভবত তা বস্তুর শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়নি, যেমনটি অন্যান্য বিষয়ে আমি বলেছি, বরং আবশ্যিকভাবে তাকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি আরও দেখিয়েছি যে, জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো মানবদেহে আত্মার স্থাপন করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। বরং শরীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে গ্রথিত করে, সংযুক্ত করে দিতে হয়, যেন তা আমাদের মতো ক্ষুধা অনুভব করতে পারে এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি হয়। অবশিষ্টাংশে আমি আত্মার গুরুত্ব বিষয়ে কিছুটা বিশদ আলোচনা করেছি। কারণ, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের ভ্রান্তির পরেই, যা আমি পর্যাপ্তভাবে খণ্ডন করেছি; এমন কোনো তীক্ষ্ণ যুক্তি নেই, যা এই ধারণা দিয়ে দুর্বল চিত্তদের কারণেই আমাদের ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করে এটা বিশ্বাস করাতে পারে যে, প্রাণী এবং মানুষের আত্মা একই প্রকৃতির। এবং জীবনাবসানের পরে আমাদের শঙ্কা অথবা আশাই থাকা উচিত নয়, যেমন উচিত নয় পতঙ্গদের। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমরা জানি তাদের পার্থক্য কতটুকু, তখন আমরা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারি যা প্রমাণ করে আমাদের আত্মা প্রকৃতিগতভাবেই শরীর থেকে মুক্ত এবং পরিণামে শরীরের সঙ্গেই আত্মার মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজন নেই। তাই আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোনো শক্তিকে দেখতে না পাই, যা আত্মাকে ধ্বংস করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাই যে আত্মা অমর।

https://nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকৃতির শিক্ষাকে আরো অগ্রসর করার কিছু পূর্বশর্ত

তিন বছর আগে যখন আমি এই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে আমার মূলসূত্র লেখা শেষ করেছিলাম এবং তা প্রকাশ করবার জন্য পর্যালোচনা করছিলাম, তখন জানতে পারলাম, যাদের কর্তৃত্ব আমি মেনে নিয়েছি এবং আমার চিন্তার ওপরে যাদের কর্তৃত্ব আমার কাজের চেয়ে কম নয় তারা পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আমার হাইপোথিসিস, যা অন্য এক জায়গায় অন্য কেউ প্রকাশ করেছিল তা অনুমোদন করেননি। আমি এটা বলতে চাই না যে, আমি সেই হাইপোথিসিস গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের ভর্ৎসনা শোনার আগে আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, এটা ধর্ম অথবা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমি কোনো কারণ দেখি না, কেন এটা আমি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করবো না, যদি আমার বিচারবুদ্ধি এর অন্তর্গত সত্য সম্পর্কে আমার প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারে। এ ঘটনা আমার ভেতরে ভীতির উদ্রেক করেছে যে, আমারও অন্য কোনো মতামত থাকতে পারে, যা থেকে আমাকে ভুল বোঝা হতে পারে। অত্যন্ত সতর্কতা ছাড়াও আমি সবসময় যে সমস্ত বিষয়কেই গ্রহণ করেছি, যা চরম নিশ্চয়তার সঙ্গে প্রতিভাত যেমন এমন কিছুই লিখিনি যা কারো জন্যই অসুবিধাজনক হতে পারে। এ ঘটনাই মূলসূত্রের বইটি প্রকাশের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, যদিও এটা তৈরির পেছনে যুক্তি যথেষ্ট শক্ত এবং প্রবল ছিল, আমার পক্ষপাতিত্ব সবসময়ই বই লেখার বিপরীতে ছিল এবং দ্রুতই বইটি প্রকাশ না করার দায় এড়াবার জন্য যুক্তি খুঁজে পেলাম। উভয় দিকের এই কারণগুলো এমনই যে, এই দুটোকে সম্পর্কিত কারার জন্য আমারই শুধু আগ্রহ নেই, বরং জনগণেরও এ থেকে কিছু শেখার আগ্রহ থাকতে পারে।

https://nagorikpathagar.org

আমার চিন্তা থেকে জ্ঞাত কোনো বিষয়ের দূরকল্পনাকে আমি কখনো প্রশ্রয় দেইনি। যখন আমার পদ্ধতির প্রয়োগের ফলাফল শুধু কিছু দূরকল্পনার বিষয়ে আমার আত্মতৃপ্তি অথবা পদ্ধতি থেকে উৎসাহিত কিছু নীতি দিয়ে আমার আচরণের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আমি তাই এটা লিখে রাখার জন্য নৈতিক দায় অনুভব করিনি। প্রত্যেকেই তার নিজের শুভবুদ্ধির মাধ্যমে এমন প্রত্যয় অর্জন করেছেন যে, প্রত্যেক মানুষই একেকজন সংস্কারক হতে পারেন যাদের ওপরে ঈশ্বর সার্বভৌমত্ব আরোপ করেছেন অথবা যাদের প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং গভীর অনুভূতি দান করে দৈববার্তা প্রেরণকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন; তাদের সংস্কার সাধনে ব্রতী হবার অনুমতি থাকতো। তাই যদিও আমার দূরকল্পনা আমাকে চরমভাবে তৃপ্ত করে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যদের নিজস্ব দূরকল্পনা রয়েছে এবং তা তাদেরকে আরো বেশি তৃপ্ত করতে পারে। যেইমাত্র আমি পদার্থবিদ্যার কিছু সাধারণ ধারণা অর্জন করলাম এবং নানা ধরনের সমস্যায় তার পরীক্ষা করছিলাম তখন লক্ষ্য করলাম, এর ব্যাপ্তি কতদূর পর্যন্ত হতে পারে এবং আজ পর্যন্ত গৃহীত নীতিগুলোর সঙ্গে তার পার্থক্য কত ব্যাপক হতে পারে। আমি দেখলাম যে, এগুলোকে আমি লুকিয়ে রেখে সেই পাপের ভাগীদার হতে পারবো না, যা আমাদের মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে। কারণ, তারা আমাকে এটা বুঝিয়ে তৃপ্ত করতে পেরেছে যে, এর ফলে অর্জিত জ্ঞান মানুষের জীবনে অনেক কাজে আসবে এবং যা এখনকার স্কুলগুলোতে পড়ানো হয়। সেই দূরকল্পিত দর্শনের শিক্ষার চেয়ে অগ্নি, জল, বায়ু, তারকামণ্ডলী, স্বর্গ এবং অন্যান্য সমস্ত বস্তু যা আমাদের চতুর্দিকে ঘিরে আছে তাদের প্রকৃতি এবং আচরণ জানার মাধ্যমে আমরা অনেক বেশি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবো। এর সঙ্গে আমরা আমাদের কর্মীদের বিশেষ দক্ষতার বিষয়ে জানি এবং তাদের দক্ষতা অনুসারে উপযুক্ত স্থানে কাজে লাগাতে পারি এবং আমাদেরকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত অধিকারী এবং নিয়ন্ত্রক করে তুলতে পারি। অজস্র যন্ত্রাবলী তৈরি করে কৃষি এবং বিশ্বের সম্পদের আস্বাদন করাই যাদের একমাত্র প্রত্যাশা হবে না বরং সুস্বাস্থ্য এবং যাবতীয় জীবনের জন্য প্রয়োজন এমন সমস্ত উত্তম বিষয়ের সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য হবে। মানুষের মন পূর্ণভাবে শরীরবৃত্তীয় রসায়নের ওপর এবং অন্যান্য অঙ্গের অবস্থার ওপরে নির্ভর করে এবং তা যদি সম্ভব হয় তবে মানুষকে আরো জ্ঞানী এবং আরো বুদ্ধিমান করে গড়ে তোলার পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি, চিকিৎসাশাস্ত্রে এটা

https://nagorikpathagar.org

খুঁজে পাওয়া যাবে। এটা সত্য যে, আজকের চিকিৎসাশাস্ত্র এ মূল্যবোধের সামান্যই ধারণ করে। কিন্তু এ সত্যকে আরো ছোট না করেই আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সকলেই এমনকি যাঁরা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত তারাও স্বীকার করবেন যে, যতটুকু আমরা জানি তা যা কিছু এখনো আবিষ্কার হয়নি তার তুলনায় নগণ্য এবং আমরা অজস্র রোগ থেকে বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতা আর জীর্ণতা থেকে মুক্তি পাবো যদি আমাদের এর কারণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকে এবং প্রকৃতি এর যে নিদান দিয়েছে সেটা যদি জানা থাকে। আমার ইচ্ছে ছিল যে, আমার সমস্ত জীবন আমি এই অতি প্রয়োজনীয় অভীষ্ট সাধনের জন্য উৎসর্গ করবো এবং আমি একটা পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছিলাম যা অব্যর্থভাবে এই গন্তব্যে পৌঁছে দেবে, যদি না আমার সংক্ষিপ্ত জীবন এবং প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্যসংখ্যক পরীক্ষা বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। আমার বিচারে এই দুই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হচ্ছে পৃথিবীকে বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করে জানানো আমি যেটুকু ইতোমধ্যেই আবিষ্কার করেছি। এবং এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন সক্ষম মানুষের কাছে আবেদন জানানো যেন আমার কাজে আরো অবদান রেখে তাঁরা যাঁর যে ধরনের পছন্দ এবং দক্ষতা আছে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। আমি আশা করেছিলাম যে, প্রত্যেকেই তাঁর নিজের শিক্ষাকে প্রকাশ করবেন, যেন পরবর্তী বিজ্ঞানীরা পূর্ববর্তীরা যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে শুরু করতে পারেন। এভাবে মানব সমাজ অনেক মানুষের জীবন এবং কর্মকে যুক্ত করতে পারবে এবং একজন একক মানুষ যতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার চেয়ে অনেক দূরের পথ অতিক্রম করবে।

আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে, জ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার প্রয়োজনীয়তাও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যেই গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখা উত্তম। আমরা আদৌ সেক্ষেত্রে মনোযোগ দিলে যা উপেক্ষা করা দুরূহ। তারপরে আমরা আরো বিরল আর নিগূঢ় অভিজ্ঞতার সন্ধান করতে পারি। এর কারণ শেষোক্তটি প্রায়শই ভুলপথে চালিত করে, যখন সাধারণ ঘটনাসমূহের কারণগুলো তখনও অজানা। কারণ, যে সমস্ত অবস্থার ওপরে তা নির্ভর করে সেগুলো এতই বিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম যে, সেগুলোকে আবিষ্কার করা দুরূহ। আমার নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল এরকম– প্রথমে আমি যা কিছু অস্তিত্বময় অথবা অস্তিত্বময় হতে পারে, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকা ছাড়া অন্য কিছুই বিবেচনা না করে তার সাধারণ নীতি অথবা প্রথম কারণ

https://nagorikpathagar.org

খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। বা আমাদের মনে যে, সত্যের সন্ধান পাই তাকেও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার না করেই। এরপরে আমি পরীক্ষা করেছি যে, এগুলোর মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে সাধারণ কার্য (Effect) খুঁজে বের করতে যা কারণ (Cause) থেকে অনুমিত হতে পারে। এ থেকে আমার মনে হয়েছে, এ পদ্ধতি দিয়ে আমি আকাশ, নক্ষত্র, এ পৃথিবী এমনকি এ পৃথিবীতে জল, বাতাস, আগুন, খনিজ এবং আরো অনেক কিছু পরীক্ষা করেছি। কারণ এগুলো সবচেয়ে সরল সাধারণভাবে সকল জায়গায় পাওয়া যায় এবং যেজন্য বুঝতে সবচেয়ে সহজ। এরপরে যখন আমি বিশেষ বিষয়ে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম, আমি দেখলাম এখানে এত বেশি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাবেশ যে, আমার বিশ্বাস জন্মাল পৃথিবীর সকল প্রজাতি এবং ধরনগুলোকে অসীমসংখ্যক বিষয়গুলো থেকে, যা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী অস্তিত্বময় হতে পারতো তা থেকে আলাদা করা মানব মনের পক্ষে অসম্ভব। তাই অনুমানের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ল এবং আমাদের যদি বুঝতে হয় এবং জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হয়, তবে আমাদের অসংখ্য পরীক্ষা করে কাজকে দেখে কারণকে আবিষ্কার করতে হতো এবং এর ফলে সমস্ত বিষয়ে পর্যালোচনা শুরু হলো যা কখনো না কখনো আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি এটা বলতে পারি, আমি এমন কোনো বিষয় খুঁজে পাইনি, যা আমার এই নীতি দিয়ে পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু আমি এটা অবশ্যই স্বীকার করি যে, প্রকৃতির শক্তি এতই বিশাল আর ব্যাপক এবং এই মূলসূত্রগুলো এতই সাধারণ আর সরল যে, আমি কখনই বিশেষ কোনো কার্য খুঁজে পাইনি যা নানাভাবে, নানাপথে অনুমানের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার কঠিনতম কাজ ছিল এগুলোর মধ্যে কোনটি সত্যিকারের ব্যাখ্যা, সেটা স্থির করা এবং এটা করার জন্য কয়েক ধরনের পরীক্ষা ছাড়া অন্য কিছু আমার জানা নেই, এই পরীক্ষাগুলোর ফলাফল তার নির্বাচিত হাইপোথিসিস অনুসারে বিভিন্ন হতে পারে।

অন্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমি এমন এক জায়গায় পৌঁছেছি, যেখান থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পারি যে, কোন পথে আমাদের এই গবেষণা অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু একইসঙ্গে পরীক্ষার ধরন এবং যে পরিমাণে প্রয়োজন তা আমার সময় এসং সম্পদ যদি সহস্র গুণেও বাড়ে তা দিয়ে সংকুলান হবে না। তাই এ অনুপাতে ভবিষ্যতে আমার এরমধ্যে কয়েকটি পরীক্ষা করার সুযোগ হবে এবং প্রকৃতির রহস্য অন্বেষণে আমি কিছুটা

https://nagorikpathagar.org

অগ্রসর হবো। এটাই আমি মূলসূত্রে বলতে চেয়েছি। আমি খুব স্পষ্টভাবে দেখাতে চেয়েছি আমার প্রকল্প কেমন উপযোগী হতে পারে যে, যারা মানবতার ভালো চান এবং শুধু সুনামের প্রত্যাশী নন–এমন ন্যায়বান, তাঁরা যদি তাঁদের ইতোমধ্যে সাধিত পরীক্ষাগুলো জানান এবং আরো যেগুলো করা প্রয়োজন সেগুলোর পথ দেখান তবে আমি কৃতার্থ হতাম।

কিন্তু তখন আমার এমন কিছু ঘটলো যে, আমি মত পরিবর্তন করলাম। আমি এখনো মনে করি, আমি যে সমস্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাদের ভেতরের সত্য আবিষ্কার চেষ্টা করবো এবং এটা করার ক্ষেত্রে এমন সতর্কতা নিয়ে লেখা উচিত যেন এই লেখাটা প্রকাশিত হচ্ছে। এভাবে আমি আমার ধারণাগুলোকে যাচাই করার জন্য আরো বেশি সুযোগ পাবো সন্দেহাতীতভাবে যা অন্যরা পারবে সেগুলো অনেক সূক্ষ্মভাবে বাছাই করি। প্রায়ই এটা লক্ষ্য করি, যখন কোনো ধারণা তৈরি হয় তখন সেটাকে যতখানি সত্য মনে হয়েছিল লিখতে গেলে সেটাকেই ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু এভাবে যদি আমি অগ্রসর হই তবে আমি মানবতার সেবার সুযোগকে হারাবো না। আমার লেখার যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে, আমার মৃত্যুর পরে যার হাতেই তা পড়ুক না কেন, তার সর্বোত্তম ব্যবহার করতেও পারবে। কিন্তু আমি স্থির করেছি, আমার জীবদ্দশায় এর প্রকাশ করা উচিত হবে না। কেননা আমার ভয় হয় এর ফলে যে বিরোধিতা এবং বিতর্ক মূল্যবান সময় নষ্ট করবে, যে সময়কে আমি গবেষণার কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছি। যদিও এটা সত্যি যে প্রত্যেকে অন্যের উপকারের জন্য যতটা বেশি সম্ভব করা উচিত এবং কারো উপকারে না আসা অকেজো হবারই নামান্তর। তবুও এটা সত্য যে, আমাদের কৌতূহল বর্তমান সময়কে ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত এবং আমাদের বংশধরদের বেশি প্রয়োজনে আসতে পারে এমন কথা চিন্তা করেই কাজ করা উচিৎ এবং যারা এখনো বেঁচে আছে তাদের সামান্য কাজে আসে এমন বিষয় এড়িয়ে যাওয়া উচিত। তাই আমাকে যেন এভাবেই মূল্যায়ন করা হয়, যে সামান্য বিষয় আমি এ পর্যন্ত জেনেছি তা আমি যা কিছু জানি না তার তুলনায় তুচ্ছ, তবুও জানার বিষয়ে আমি হতাশায় ভুগি না। যারা ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানে সত্যের আবিষ্কারের পক্ষে তাদের সকলের জন্যই একই রকম। যারা ধনী হতে শুরু করেন, তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যখন তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ছিলেন এবং অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার চেয়ে অনেক সহজে। অথবা আমরা সেনাপতিদের সঙ্গে বিষয়টা তুলনা করতে পারি।

https://nagorikpathagar.org

যার সেনাদল তার বিজয়ের সংখ্যার সঙ্গে আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে এবং এই সেনাদলকে পরাজয়ের সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে তার অধিকতর নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়, যতটুকু না প্রয়োজন হয় কোনো নগর অথবা পুরো প্রদেশ বিজয়ের সময়। সত্য আবিষ্কারের পথে সব বাধা এবং ভ্রান্তিকে জয় করাটা এক ধরনের যুদ্ধই এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভ্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পরাজয়েরই নামান্তর। এ ধরনের পরাজয়ের পরে আমাদের আগের অবস্থায় আবারও সংহত করার জন্য ইতঃপূর্বে সুপরীক্ষিত নীতিগুলো অর্জন করার জন্য বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটানোর চেয়েও বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বিজ্ঞানের কিছু সত্য খুঁজে পেয়ে থাকি এবং বিশ্বাস করি মূলসূত্রে গ্রথিত বিষয়গুলো পাঠকের প্রত্যয় উৎপাদন করবে যে, আমি সেই সত্যকে খুঁজে পেয়েছি। আমি এটা বলতে পারি যে, এগুলো আমি যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি সেগুলোর মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয়টা মূল সমস্যা নিয়ে কাজের ফলাফল এবং পরিণতি। এগুলোকে আমি অগুণতি যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করি, যেখানে ভাগ্য আমার সহায় ছিল। আমি আরো একটু অগ্রসর হয়ে বলতে চাই যে, আমি মনে করি একই মাত্রায় দুই অথবা তিনটি বিজয় আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে এবং আমি এত বৃদ্ধ নই যে, আমি এই কারণে প্রকৃতির সহজাত পরিক্রমার মাধ্যমে অফুরন্ত অবসরের প্রত্যাশা করবো না। আমি আমার অবশিষ্ট সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য আরো বেশি দায়িত্ব অনুভব করি। এটা সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য আশা আমার আছে এবং নিঃসন্দেহে আমি পদার্থবিদ্যার বিষয়ে আমার মূল লেখাগুলো প্রকাশ করলে সময় অপচয়ের অন্য অনেক সুযোগ পাবো। আমার মূলনীতিগুলো এত স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ যে, এগুলো বুঝতে পারা মানেই তা বিশ্বাস করা, যদিও এমন একটিও বিষয় আছে বলে আমি মনে করি না যেটা আমি করে দেখাতে পারবো না। তা সত্ত্বেও তারা সম্ভবত মানুষের নানা ধরনের মতামতের সঙ্গে একমত না হতেও পারেন। তাই আমার মনে হয়, আমি এই প্রসঙ্গে বিরোধিতার কারণে আমার মূল কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি হবো।

কেউ কেউ এ বিষয়ে তর্ক তুলতে পারেন যে, এই বিরোধিতা একদিক থেকে উপকারী আংশিকভাবে এ কারণে যে, তা আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দেবে এবং অংশত এ কারণে যে, এ লেখার মধ্যে যদি মূল্যবান কিছু থেকে থাকে তা অনেকেই জানতে পারবে এবং তাঁদের অন্তর্গত ক্ষমতা দিয়ে আমাকে দ্রুত সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু যখনই আমি

https://nagorikpathagar.org

বুঝতে পেরেছি যে, আমার ভুল করার সম্ভাবনাই বেশি এবং যখন খুব কম সময়েই আমার মনে উত্থিত প্রথম চিন্তাকে আমি গুরুত্ব দিই। এদতসত্ত্বেও বিরোধিতা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাকে এটাই বলে যে, এ থেকে আমার উপকৃত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ, আমি উভয়পক্ষের সুবিবেচনা পেয়ে ধন্য, যাদের আমি বন্ধু হিসেবে পেয়েছি তাদের আর যারা আমার সম্পর্কে উদাসীন তাদেরটাও এমনকি আমার সেই স্বল্পসংখ্যক বন্ধুরা যারা আমার প্রতি চরম বিদ্বেষ আর হিংসা প্রকাশে তৎপর–আমি জানি তারা অনেক চেষ্টা করেই তা লুকিয়ে রাখত। যদিও আমার ক্ষেত্রে এমনটা কখনো ঘটেনি যে, একটা সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে আগে থেকেই অনুমান করা যায়নি, শুধু সেটা সম্ভব হয়নি যখন তা দূরাগত বা খুবই কষ্টকল্পিত। শুধুমাত্র দুর্বল ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াগুলোই আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে, যে সমস্ত যুক্তিগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চর্চা করা হয়, সেগুলো কখনো এমন সত্যের খোঁজ করে না যা অজ্ঞাত ছিল। কারণ যখন প্রত্যেকেই নিজেকে সঠিক মনে করে তখন সকলেই দু'দিকের প্রমাণের প্রাবল্য বিবেচনা না করে তাঁর নিজের মতকে সঠিক বলে প্রতিভাত করানোর চেষ্টা করে। তাই যারা ভালো উকিল তারা পরবর্তীকালে ভালো বিচারক হতে পারে না।

আমার ধারণাগুলো শুনে যে সমস্ত সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তা বিরাট কিছু নয়, বিশেষ করে যখন আমার ধারণাগুলো এমন একটা অবস্থায় আছে যার ব্যবহারিক উপযোগিতার পর্যায়ে পৌঁছতে হলে আরো অনেক পরিশীলনের প্রয়োজন। আত্মশ্লাঘা ছাড়াই আমি এটা বলতে পারি যে, এই কাজটা যদি কারো সম্পন্ন করার ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে সেটা আমারই আছে। তার মানে এই নয় যে, পৃথিবীতে আমার মতো উন্নত মানের মানুষ আর নেই। বরং আমরা কখনো কোনো বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি না অথবা আত্মস্থ করি না, যদি না আমরা নিজেরাই আবিষ্কার না করে বিষয়টা অন্যের কাছে থেকে বুঝতে চাই। এই প্রসঙ্গে এটা অত্যন্ত সত্যি যদিও আমার মতগুলো কয়েকজন বুদ্ধিমান মানুষকে বলেছি, যখন আমি ব্যাখ্যা করেছি সেই সময় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিষয়টা বুঝেছেন বলে মনে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও যখন তারা পুনর্বার একই বিষয় বলেছে তখন লক্ষ্য করেছি যে, বিষয়বস্তু এত বেশি পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, আমি সেটাকে আর নিজের মত বলে গ্রহণ করতে পারিনি। এই সুযোগে আমার পরবর্তী প্রজন্মকে এটা বলা উচিত যে, আমার মত হিসেবে তারা যেন কোনো কিছুকেই গ্রহণ না করে যদি

https://nagorikpathagar.org

আমি নিজে প্রকাশ না করি। প্রাচীন সে সমস্ত দার্শনিক যাদের কোনো প্রকাশিত লেখা নেই, তাদের ওপরে যে মাত্রাতিরিক্ত অসংযম আরোপিত হয়েছে তাতে আমি মোটেও বিস্মিত হই না বা তাদের ধারণাগুলোকে আমি অযৌক্তিক বলেও বিবেচনা করি না। তাঁরা সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। তাই আমি মনে করি, তাদের ধারণাগুলো বাজেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে, বিরল কিছু ক্ষেত্র ছাড়া তাঁদের শিষ্যরা জ্ঞানে বুদ্ধিতে তাঁদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি যে, অ্যারিস্টটলের সবচেয়ে নিবেদিত শিষ্যও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো যদি তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতো প্রজ্ঞা থাকতো। এমনকি যদি শর্তও জুড়ে দেয়া হতো যে, এর বাইরে আর কোনো জ্ঞানের অধিকারী তারা হতে পারবে না তবুও তারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতো। তারা আসলে লতার মতো, যা সেই বৃক্ষের শরীর জুড়ে থাকে, তার চেয়ে বেশি উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না আবার কখনো কখনো সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে নিম্নগামী হয়। এজন্য আমার মনে হয়েছে অনুগামীরা সর্বদাই নিম্নগামী হয় অর্থাৎ তারা বুদ্ধিদীপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা বিষয় বুঝতে অসমর্থতার কারণে তৃপ্ত না হয়ে পাঠ করা থেকে বিরত থেকে নিজেদের কম প্রজ্ঞাবান করে তোলে।

এমনটা হতো না, যদি তারা অমিত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতো যেগুলো সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীরা কিছুই বলে যাননি অথবা চিন্তাও করেননি। একইভাবে যে পদ্ধতিতে তারা একেকটি বিষয়ে দর্শন প্রযুক্ত করেছেন তা মধ্য মেধার মানুষের জন্য খুব সুবিধাজনক। তাদের তত্ত্বের দুর্বোধ্যতা আর বিশিষ্টতা দিয়ে সকল বিষয় সম্পর্কে এমন সাহসের সঙ্গে বলা যেন, পরিপূর্ণভাবে বিষয়টি তাদের আত্মস্থ এবং তারা যা বলেন, তাকে বুদ্ধিদীপ্ত এবং গভীর চিন্তাবিদের আক্রমণ থেকে চতুরতার সঙ্গে এমনভাবে রক্ষা করেন যেন তাদেরকে মতান্তরিত করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। এভাবে আমার কাছে তাদেরকে অন্ধ মানুষের মতো মনে হয়, যেন একই শর্তে দৃষ্টিমান কারো সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় এবং এইভাবে ঘন অন্ধকারের গুহায় নিয়ে এসে দৃষ্টিহীনের মতো দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে যুদ্ধ করতে বলে। আমি বলতে পারি, সেসব মানুষ আমার দর্শনের মূলনীতি সম্পর্কে লেখা প্রকাশ থেকে বিরত থাকার ঘটনায় উৎসাহিত হয়, যেহেতু এগুলো খুবই সাদামাটা এবং তাদের প্রতি আমি অনেকটা তেমন কাজই করবো যা অনেকটা বদ্ধ গুহার জানালা খুলে কিছু আলো আসতে দেয়ার মতো ব্যাপার হবে– সেই বদ্ধ গুহায় যেখানে তারা

https://nagorikpathagar.org

যুদ্ধ করার কর্তব্য থেকে ইস্তফা দিয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও আমার মূলনীতি সম্পর্কে জানতে অনাগ্রহী হতে পারেন, যদি তারা সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কথা বলতেই বেশি আগ্রহী হন এবং সেভাবেই জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হতে চান। তবু তাঁরা অনায়াসেই সত্যের আভাস পেয়ে তৃপ্ত হতে পারেন, যার জন্য প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের মতো পরিশ্রম করতে হয় না। সত্যকে অল্প অল্প করে সামান্য কয়েকটি বিষয়ে আবিষ্কার করা যায়। তাই যাঁরা সত্যের অনুসন্ধান করেন তাঁরা প্রায়ই সেইসব বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞ স্বীকার করেন যা তিনি নিজে অনুসন্ধান করেননি। কিন্তু যদি তাঁরা ক্ষুদ্র সত্যকে সবজান্তার আত্মশ্লাঘার চেয়ে উচ্চে স্থান দেন, বাস্তবিক অর্থেই যা প্রত্যাশিত এবং তাঁরা যদি আমার বর্ণিত একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান তবে আমার পক্ষ থেকে তাঁদের এই ডিসকোর্সে যা কিছু বর্ণনা করেছি তারচেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। কারণ, যদি তাঁরা আমার চেয়ে আরো অগ্রসর হওয়ার সামর্থ্য রাখেন তবে তারা আমি যা কিছু খুঁজে পেয়েছি বা চিন্তা করেছি তার সবকিছুই খুঁজে পাবেন। এটা আরো বেশি সত্য যে, আমি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছি। তাই এটা নিশ্চিত যে, যা কিছু এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি তা প্রকৃতিগতভাবেই অনেক জটিল এবং আমি এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছি তারচেয়ে অনেক বেশি গূঢ়। অবশ্য তাঁরা আমার কাছে বিষয়টি জানার চেয়ে নিজের নিজের আবিষ্কারের আনন্দকে বেশি মূল্য দেবেন। একইসঙ্গে তাঁরা তুলনামূলকভাবে সহজ বিষয় দিয়ে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গভীরে প্রবেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলবেন, যে অভ্যাস আমার দেয়া সমস্ত তথ্যের চেয়ে উপকারী বলে প্রমাণিত হবে। আমার বিষয়ে বলতে পারি, আমি যে সমস্ত সত্য উদ্‌ঘাটন করেছি সে সম্পর্কে যদি যুবাকালে প্রশিক্ষিত হতাম এবং বিনা আয়াসে তা আত্মস্থ করতে পারতাম তবে সম্ভবত আমি অন্যকিছু শিখতে চাইতাম না অথবা কমপক্ষে আমি আমার সত্য অনুসন্ধানের এই অভ্যাস, দক্ষতা এবং স্পৃহা অর্জন করতে পারতাম না। এক কথায়, পৃথিবীতে যদি কোনো কাজ থাকে, যে কাজ কেউ শুরু করে শেষ করতে না পারলে অন্য কেউ তা করতে পারবে না, তাহলে একটাই সেই কাজ যা এখন আমি করছি।

এটা সত্যি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ সবগুলো পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়; কিন্তু সে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে যথার্থভাবে এ কাজে লাগাতেও পারবে না, যদি না তাদেরকে যথাযথ পারিশ্রমিক দেয়া হয়। সে সমস্ত

https://nagorikpathagar.org

লোক কিছু পাওয়ার আশায় কাজ করবে যা একটা কার্যকর প্রণোদনা। স্বেচ্ছাকর্মীরা, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৌতূহলের বশে অথবা শেখার আকাঙ্ক্ষায় কাজ করতে আসে, তারা সাধারণত তাদের প্রতিজ্ঞার চেয়ে দক্ষতায় দুর্বল; তারা অবাক করার মতো কিছুই দিতে পারে না। তারা সমস্যাগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা করতে ভুল করে না অথবা কমপক্ষে প্রশংসাসূচক এবং অর্থহীন আলাপচারিতার আকাঙ্ক্ষা করে এবং অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক মূল্যবান সময় অপচয় করে ফেলে। এ ধরনের কাজ শেষ বিচারে নিরেট অপচয় হয়ে দেখা দেয়। অন্যরা যে সমস্ত পরীক্ষা আগেই সম্পাদন করেছেন, যদিও তারা সেটা জানানোর জন্য উদগ্রীব ছিলেন কিন্তু যারা জ্ঞানকে গুপ্তবিদ্যা মনে করেন তারা কখনো তা জানান না, তাদের লেখাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত জটিল অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা আর এত অপ্রয়োজনীয় উপকরণে ভর্তি যে, একজন গবেষকের পক্ষে এরমধ্য থেকে মূল সত্যটি খুঁজে বের করা খুব কঠিন। এছাড়াও এটা দেখা যায় সমস্ত পরীক্ষাই অত্যন্ত দুর্বলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এমনকি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ, যারা এটা সম্পাদনা করেছেন তারা নিজেদেরকে বাধ্য করেছেন যেন পরীক্ষাগুলো তাদের অনুসৃত নীতির সহায়ক হয়; যদি এরমধ্যে কোনোটা ব্যবহার উপযোগীও হতো তার মূল্য ওগুলোকে খুঁজে বের করার সময়ের তুলনায় নগণ্য। তাই যদি পৃথিবীতে এমন কেউ থাকে যিনি প্রশ্নাতীতভাবে বৃহৎ ও অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারগুলো করার ক্ষমতা রাখেন এবং অন্য সবাই যদি তার লক্ষ্য অর্জনে সবকিছু দিয়ে সাহায্যও করতে চান, আমি মনে করি, সেক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষাগুলো সম্পাদনের জন্য খরচ জোগানো এবং গবেষকের অবসরকে কেউ যাতে বিরক্তিকর উপদ্রব দিয়ে বিনষ্ট করতে না পারেন এটা নিশ্চিত করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার নেই। কিন্তু আমি সবকিছু নিজের কাঁধে নিয়ে অসম্ভব কিছু করার শপথ করছি না অথবা নিজেকে অর্থহীন এমন কল্পনায় নিমজ্জিত করছি না যে, জনগণ আমার পরিকল্পনা অভূতপূর্ব সাড়া দেবে। পরিশেষে আমি মানসিকতায় এতটা নিচুস্তরের নই যে, যেকোনো লোক বদান্যতা দেখাতে চাইলেই আমি গ্রহণ করবো যদি এটা মনে করা হয় যে, আমি তার উপযুক্ত নই।

এই সমস্ত বিবেচনা একত্রে আমাকে তিন বছর আগে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করাল যে, আমার হাতে এখন মূলসূত্রের যে লেখা আছে তা আমি প্রকাশ করবো না এবং স্থির করলাম আমার জীবদ্দশায় কাউকে এমন সাধারণ প্রকৃতির কোনো লেখা পড়তেও দেবো না যেন

https://nagorikpathagar.org

পদার্থবিদ্যায় আমার রচিত ভিত্তিগুলো তারা বুঝতে পারেন। কিন্তু এর পরে দুটো ঘটনা ঘটল যার জন্য আমাকে বাধ্য হয়ে কিছু অনুপুঙ্খ বর্ণনার এবং জনগণকে আমার কাজের এবং পরিকল্পনার কিছু আভাস দেয়া প্রয়োজন। প্রথম কারণ হচ্ছে, যদি আমি এটা না করি তবে যারা আমার বই প্রকাশের পূর্বপরিকল্পনার বিষয়ে অবহিত ছিল। তারা মনে করতে পারে যে, আমার গ্রন্থ না প্রকাশ করার পক্ষে যুক্তিগুলো ছেঁদো। যদিও আমি সুনামের তোয়াক্কা করি না; এমনকি আমি এও বলে থাকি যে, এটা আমি অপছন্দ করি এবং মনে করি এটা মনের শান্তি বিনষ্ট করে; মনের শান্তিকে আমি সবার ওপরে স্থান দিই। এতদসত্ত্বেও আমি আমার কাজগুলোকে অপরাধীদের কাজের মতো লুকিয়েও রাখিনি। আবার নিজেকে অপরিচিত করে রাখার কোনো চেষ্টাও করিনি। অংশত এ কারণে যে, আমার যদি কখনো মনে হয় যে, নিজের ওপরে এ বিষয়ে অন্যায় করেছি এবং অংশত তা কিছুটা হলেও অস্বস্তি তৈরি করতে পারতো, যেটা আমার কাঙ্ক্ষিত মনের শান্তিকে বিনষ্ট করতে পারতো। আমি সবসময় সুনামের অধিকারী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক থাকতে চেয়েছি। কিন্তু যেহেতু আমি কোনোটা উপেক্ষা করতে পারিনি; তাই আমি চেষ্টা করেছি অন্তত খারাপটা যেন আমি অর্জন না করি। অন্য যে আরেকটি কারণে আমি লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি সেটা হচ্ছে, আমি নিজেকে আলোকিত করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলাম তার ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকা। কারণ, যে অসীমসংখ্যক পরীক্ষা আমাকে করতে হবে সেটা অন্যের সাহায্য ছাড়া অর্জন করা অসম্ভব যদিও আমি নিজেকে মিথ্যে আশা দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাই না যে জনগণ আমার কাজে অতি উৎসাহিত হয়ে উঠবে। তা সত্ত্বেও আমি নিজের ভালো যেটাতে হয়, সেটাতে অমনোযোগি হতে চাই না; যাতে আমাকে যারা মৃত্যুর পরে তিরস্কার করবে তাদের লক্ষ্যবস্তু না হয়ে উঠি এই অভিযোগে যে, আমি কিছু অর্জন করতে পারতাম যদি না আমি যা কিছু করেছি তা ব্যাখ্যা করার বিষয়ে উদাসীন না থাকতাম আর প্রকাশ করতাম কীভাবে অন্যরা আমার পরিকল্পনার অংশীদার হতে পারে।

আমি ঠিক করলাম যে, সবচেয়ে সহজ হবে এমন কোনো বিষয় বেছে নেয়া যা খুব বেশি বিতর্কিত নয় এবং যা আমার মূলনীতির যতটুকু প্রকাশ করতে চাই তার বেশি প্রকাশ করতে বাধ্য করবে না এবং যা খুব স্পষ্টভাবে দেখাতে পারবে যে বিজ্ঞান বিষয়ে আমি কী করতে পারবো না। আমি সফল হয়েছি কিনা সেটা আমার বলার বিষয় নয় এবং আমার

https://nagorikpathagar.org

লেখার বিষয়ে অন্যের বক্তব্যকেও আমি প্রভাবিত করতে চাই না। তবুও আমি পাঠককে অনুরোধ করছি যেন তারা তা মূল্যায়ন করার সুবিধার জন্য পরীক্ষা করেন। আমি আরো অনুরোধ করছি যদি কেউ কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন তাহলে তা কষ্ট করে আমার প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি আমাকে অবহিত করবেন এবং দ্বিমত প্রকাশের সময়েই আমার উত্তর যাতে প্রকাশিত হয় তার চেষ্টা করবো। এভাবেই পাঠক যখন দুটো লেখাই একসঙ্গে দেখবেন তখন সহজেই সত্যের মূল্যায়ন করতে পারবেন। তাই আমি কখনো দীর্ঘ প্রত্যুত্তর দেয়ার প্রতিজ্ঞা করছি না, শুধু খোলাখুলিভাবে আমার ভুলগুলো স্বীকার করবো যদি আমি সেগুলোকে ধরতে পারি। অথবা যদি আমি নিজে সেগুলোকে ধরতে না পারি তবে সহজভাবে বলবো আমি যেটা লিখেছি তা কোনো বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লিখেছি। কিন্তু আমি কোনো নতুন বিষয়ের ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হবো না এই ভয়ে যে, এটা করতে গিয়ে আমি অন্তহীন কাজের বন্ধনে আটকা পড়ে যাবো।

অপটিকস্ এবং আবহবিদ্যার প্রারম্ভে আমি কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করেছিলাম, যেগুলোকে প্রথম দর্শনে আপত্তিকর মনে হতে পারে। কারণ আমি সেগুলোকে হাইপোথিসিস বলি এবং প্রমাণের চেষ্টা করিনি। পাঠককে ধৈর্য এবং মনোযোগ সহকারে পুরোটা পড়তে দেয়া হলে আমার বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত তারা তৃপ্ত হবেন। কারণ, আমার মনে হয় যুক্তিগুলো একে অন্যকে এমনভাবে অনুসরণ করে। যাতে শেষ নিয়মটি ব্যাখ্যাত হয় প্রথমটি দিয়ে যা অন্যগুলোর কারণ। সেভাবেই উল্টোভাবে প্রথমগুলোর কারণ শেষটি দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়। এবং কেউ যেন এটা ভেবে না বসেন যে, এখানে আমি প্রতারণামূলক কিছু দেখাচ্ছি যাকে যুক্তিবাদীরা বলেন, Circular reasoning যেহেতু অভিজ্ঞতা প্রায় সব কার্যকেই নিশ্চিতভাবে দেখে কারণ হিসেবে আমরা যা অনুমান করি তা বিষয়টাকে প্রমাণের চেয়ে বরং ব্যাখ্যাই বেশি করে। অন্যদিকে হাইপোথিসিস বলেছি শুধু বিষয়টিকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য যদিও আমি মনে করি, আমি হাইপোথিসিস প্রথম সত্য (First truth) থেকে অনুমান করতে পারি যা আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি। আমি খোলাখুলিভাবে ইচ্ছা করি এভাবে যেন অনুমান না করা হয়। এক ধরনের মানুষ আছেন যারা মনে করেন, অন্যরা যা বিশ বছর ধরে চিন্তা করে জেনেছেন তা এক দিনেই একটা দুটো শব্দ শুনেই জেনে যাবেন এবং যাদের ভুল করার সম্ভাবনা আছে ও সত্যকে গ্রহণ করতে কম উপযুক্ত, তারাও মনে করে আমারও ভুল হতেই

https://nagorikpathagar.org

পারে। সে কারণেই আমি কিছু বিশেষ মানুষকে আমার চিন্তাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করতে দিতে চাইনি। তারা যেটাকে আমার চিন্তা বলে ধারণা করবে সেই ভ্রান্ত চিন্তার দয়া আমি নিতে চাইনি। আমার সত্যিকারের মতামত হচ্ছে, আমি যেগুলো আমার একান্ত নিজস্ব চিন্তা তার নতুনত্বের জন্য ক্ষমা চাই না। বিশেষ করে আমি যখন নিশ্চিত, যে কেউ এই যুক্তির মাধ্যমে দেখবে যে, আমার এই চিন্তা এত সাধারণ এবং সাধারণ প্রজ্ঞার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এটা এমনভাবেই খাপ খেয়ে যায় যে, একই বিষয়ে অন্য কোনো ধারণার চাইতে আমার ধারণা অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত বলে কারো মনে হবে। আমি নিজেকে এই ধারণাগুলোর প্রথম আবিষ্কর্তা বলে প্রচার করতে চাই না কিন্তু এটা বলতে চাই, যখন আমি কোনো কিছু গ্রহণ করেছি তখন এই কারণে তা গ্রহণ করিনি যে, এই কথাটা আগে কেউ বলেছে এবং গ্রহণ করেছে। তখন যখন আমার যুক্তিবোধ তাকে অনুমোদন দিয়েছে।

অপটিকসে বর্ণিত আবিষ্কার যদি এখনই সম্ভব না হয়, তবে ভ্রান্তির কারণে তা সম্ভব হলো না বলে আমি মনে করি না। অনেক অনুশীলন এবং দক্ষতার সাহায্যে আমার বর্ণিত যন্ত্রগুলো তৈরি এবং বিন্যস্ত করতে হয়। কোনো ত্রুটি ছাড়া প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফলভাবে চালু হলে আমি বরং বিস্মিতই হবো। যেমন– কেউ যদি প্রথম দিনেই অপূর্ব বীণা বাদন শিখে ফেলে এই কারণে যে, তাকে চমৎকার স্বরলিপি দেয়া হয়েছে। আমি আমার শিক্ষকদের ভাষা ল্যাটিনের পরিবর্তে আমার মাতৃভাষা ফরাসিতে লিখেছি। তার কারণ হচ্ছে, আমি আশা করি, যাদের প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিমত্তা আছে তারা ভালোভাবে আমার বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবে। প্রাচীন পুঁথির লেখার বাইরে আর কিছু যারা বিশ্বাস করে না, তাদের চেয়ে যারা উন্নতবোধের সঙ্গে অধ্যয়নের মেলবন্ধন করে, তাদেরকে আমার বিচারক হতে আহ্বান করি। আমি নিশ্চিত তারা ল্যাটিনের বিষয়ে এত পক্ষপাতমূলক হবেন না যে, আমার মতগুলোকে বর্জন করবেন শুধু এই কারণে যে, একটা অমার্জিত ভাষায় আমি সেগুলোকে ব্যাখ্যা করছি। অন্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি এখানে বিস্তৃতভাবে বলতে চাই না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা আমি ভবিষ্যতে করবো বলে আশা করি, জনগণের কাছে এ বিষয়ে কোনো প্রতিজ্ঞাও করতে চাই না। কারণ, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই যে, তা আমি পূরণ করতে পারবো। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার অবশিষ্ট জীবন প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের কাজে নিবেদিত করবো এমন কিছুর সন্ধানে যা চিকিৎসাবিদ্যার এমন কিছু

https://nagorikpathagar.org

নিয়ম আবিষ্কার করবে যা বর্তমানে যা চলছে তার চেয়ে নিশ্চিততর হবে। অন্যান্য বিষয় থেকে আমার ব্যক্তিগত ঝোঁক দূরীভূত হয়েছে; বিশেষ করে যেগুলো অনেকের ক্ষতি করে, উপকার সামান্যই করে। যদি পরিবেশ আমাকে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধ্য করে আমি মনে করি না যে, আমি সেগুলোকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবো। এখানে আমি যা ঘোষণা করছি, আমি ভালো করেই জানি, আমাকে তা কোনো পার্থিব সুবিধা দেবে না। আমার অবশ্য সে জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। যাঁরা এই পৃথিবীতে আমাকে সবচেয়ে সম্মানজনক কাজের জায়গা উপহার দেবে আমি তাদের চাইতে সেই সমস্ত মহৎ মানুষের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো যাঁদের আনুকূল্যে আমি নিরবচ্ছিন্ন অবসর উপভোগ করতে পারবো।

https://nagorikpathagar.org

Notes

https://nagorikpathagar.org

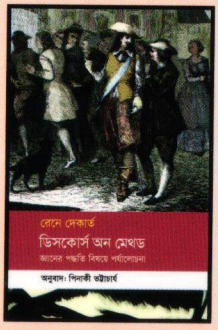

Discourse on Method
জ্ঞানের পদ্ধতি বিষয়ে পর্যালোচনা
Translated by Pinaki Bhattacharya
Published by Sucheepatra
e-mail : saeedbari07@gmail.com
www.facebook.com/sucheepatra
www.rokomari.com/sucheepatra

ISBN 978-984-93387-9-6

https://nagorikpathagar.org